গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

অম্লান দত্ত

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

দুই টাকা

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৫

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট, কলি-১২ হইতে জি, ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শতাব্দী
প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড হইতে মুরারিমোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

মা

ও

বাবাকে

এই চারটি প্রবন্ধ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বলে একসঙ্গে মুদ্রিত হল। প্রবন্ধচতুষ্টয়ে দেশের ও বর্ত্তমান পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপর আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে। এর কয়েকটি ইতিপূর্বে "চতুরঙ্গ" ও "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ক'লকাতা
বৈশাখ, ১৩৬৫

অম্লান দত্ত

॥ সূচীপত্র ॥

গণতন্ত্র ও সমাজবিবর্তন

॥ এক ॥

সমাজবিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে শিক্ষণীয় বস্তু আছে। এ-বিষয়ে পরস্পর বিরোধী নানা তত্ত্ব বা থিওরী এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সত্য নির্ধারণে সুবিধা হবে, একথা সন্দেহাতীত।

এই অর্ধশতাব্দীতে পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। পঞ্চাশ বৎসর আগের ব্রিটেন, বা আমেরিকা, বা সুইডেনের সঙ্গে আজকের ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনের পার্থক্য সামান্য নয়। পঞ্চাশ বৎসর আগে আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি ছিল নগণ্য, আজ মার্কিণ শ্রমিকের সাংগঠনিক শক্তি অসামান্য। শ্রমিক আন্দোলনের সংঘবদ্ধ শক্তিকে গণনার মধ্যে না-নিয়ে যাঁরা মার্কিণ পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিচার করতে বসেন তাঁরা আজকের মার্কিন সমাজকে চেনেন না। সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ব্রিটেন-সুইডেনে দেশব্যাপী সমবায় সংগঠন এই বৃহৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই বিশেষ অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বহু বিচিত্র আয়োজনও এই আন্দোলনের আর একটি দিক। সাধারণ মানুষকে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে সজাগ করবার ও সাধারণ মানুষের প্রয়োজন সাধনে সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করবার প্রয়াস ক্রমশই এগিয়ে চলেছে।

সামাজিক সাম্য এসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা এখনও বলা চলে না। বহুক্ষেত্রে অসাম্য প্রকট। মার্কিন দেশে নিগ্রোদের সমস্যা সুবিদিত। আর শ্রমিক-দলের শাসন সত্ত্বেও ব্রিটেনে সম্পত্তির

বণ্টনে অসাম্য প্রবল। কিন্তু এসব দেশে গত অর্ধশতাব্দীতে সামাজিক সাম্যের দিকে অগ্রগতি অনস্বীকার্য। সম্পত্তির বণ্টনে গভীর অসাম্য আছে বটে; কিন্তু সম্পত্তি থেকে আয়লাভের পথ সংকুচিত হয়েছে। পারিবারিক আয় বণ্টনের এক হিসাবে প্রকাশ যে, ব্রিটেনের শতকরা যে পাঁচভাগ পরিবারের আয় সর্বোচ্চ, দেশের মোট পারিবারিক আয়ে তাদের অংশ ছিল ১৯১৩ সালে শতকরা ৪৩ ভাগ, আর ১৯৪৭ সালে শতকরা ২৪ ভাগ। আয়কর বাবত দেয় অংশ আয় থেকে বিয়োগ না করেই এই হিসাব।* অর্ধশতাব্দী আগে ব্রিটেন-আমেরিকায় উচ্চবিত্তদের আয়ের উপর যে হারে কর ধার্য হত নিম্ন মধ্যবিত্তদের আয়ের উপরও প্রায় সেই হারই ধার্য ছিল। আজ সর্বোচ্চ আয়ের উপর করের হার শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ পর্যন্ত পৌঁছেচে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে; বেকার-ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার ক্রমশ উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের সমস্ত দাবী পূর্ণ না-হলেও দাবী পূরণের পথ ক্রমশই প্রশস্ত হচ্ছে।

জনসাধারণের সংঘবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই অগ্রগতি সম্ভব হত না। কিন্তু ব্রিটেন-আমেরিকা-সুইডেনে গণতন্ত্রের এই অগ্রগতি বিপ্লবের পথে ঘটে নি, বরং সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের পথেই ঘটেছে।**

---

*Simon Kuznets. "Economic Growth and Income Inequality", The American Economic Review, March, 1955

** ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর গণতন্ত্র অসম্ভব একথা আধাসত্য মাত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্র পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না; কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিতর থেকেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হওয়া সম্ভব এবং ধনতন্ত্রের ক্রমান্বিত সংস্কারের ভিতর দিয়ে এই আন্দোলন ধাপে ধাপে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

শাস্ত্রশাসিত পরিবর্তন অসহিষ্ণু সমাজে নূতন চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমপরিবর্তন সম্ভব হয় না; এ-দুয়ের ভিতর বিরোধ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক সমাজে নূতন চিন্তা ও সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমান্বিত সংস্কার ঘটে; ফলে পুঞ্জীভূত অসামঞ্জস্যের শোধনের জন্য বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

বিপ্লববাদী তর্ক তুলবেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, আর এই ভিত্তির আমূল পরিবর্তন যে-দিন প্রয়োজন হবে সে-দিন কি সংস্কারের পথ পরিত্যাগ করে বিপ্লবের পথ অনিবার্য হবে না? কিন্তু অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যেমন ক্রমপরিবর্তন সম্ভব, সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকারেরও তেমনই। সম্পত্তির উপর কর, বা সম্পত্তির একাংশে মৃত্যুর পর সরকারী অধিকার প্রবর্তন, আজ সংস্কারপন্থী কার্যক্রমের অঙ্গবিশেষ; অথচ উনিশ শতকী দৃষ্টিতে এ-ধরণের কার্যক্রম ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৌল অধিকারে অসহ্য হস্তক্ষেপ। সম্পত্তির অধিকার বলতে আমরা বুঝি, ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী সুচিহ্নিত কোনো সম্পদের নিয়োগ অথবা ব্যবহারের অধিকার। এই অধিকারকে অন্যান্য বহু অধিকারের মতই সামাজিক নানা সর্ত ও দায়িত্ব দিয়ে বেষ্টন করা যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করে সমাজের অধিকারকে সম্পত্তির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত করা সংস্কারপন্থিতার বিরোধী নয়। শিল্প থেকে অংশীদারদের লভ্য আয় সীমায়িত করে দেওয়া কোনো সংস্কারবাদী সরকার নিজের অধিকার বহির্ভূত মনে করেন না; বিশেষ কোনো শিল্প নিজের হাতে তুলে নিয়ে সরকার পূর্বতন অংশীদারদের একটা বার্ষিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দিলে, অবস্থার কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে না;

আর বর্তমান অংশীদারদের মৃত্যুর পর এই বার্ষিক বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া, অথবা মৃত্যুকালীন শুল্ক হিসাবে সম্পত্তির একটা বড় অংশ সরকারী তহবিলে হস্তান্তরিত করা, কিছু বৈপ্লবিক ব্যাপার নয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় বৈপ্লবিক পদ্ধতি ছাড়াও ধাপে ধাপে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব।

॥ দুই ॥

অপরপক্ষে যে-সব দেশ এক ধাক্কায় আমূল পরিবর্তন আনতে চেয়েছে তাদের বৈপ্লবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এর উদাহরণও এই অর্ধশতাব্দীতে কম নেই।

অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯১৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯২১ সালের আরম্ভ পর্যন্ত সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাবার এক বৈপ্লবিক সাধনা চলছিল। পুঁজিপতিদের সমাজে অর্থনৈতিক কাজকারবার চলে বাজারে লেনদেনের সাহায্যে, টাকার মাধ্যমে। নূতন কম্যুনিস্ট অর্থনীতিতে এসব কিছুই থাকবে না, টাকার ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমিতির তত্ত্বাবধানে মালমসলা ও উৎপাদন-দ্রব্যের গতি নির্ধারিত হবে, এমন একটা ভাবনা বৈপ্লবিক উৎসাহের সঙ্গে কার্যে পরিণত করবার প্রয়াস চলছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা চালানো সম্ভব হল না। তৎকালীন অর্থনৈতিক দুর্গতি অংশত গৃহযুদ্ধের অনিবার্য ফল, আর অংশত এই বৈপ্লবিক অসাধ্য সাধনের ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণতি। অল্পকালের ভিতর মোট উৎপন্নের পরিমাণ ভয়ঙ্করভাবে কমে গেল। সেই সঙ্গে ব্যাপক

দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব, যাতে না কি পঞ্চাশ লক্ষেরও অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দেশময় সাধারণ মানুষের বিরোধিতার ফলে এই বৈপ্লবিক সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে হল।*

১৯২১ সালে নূতন অর্থনৈতিক নীতি গৃহীত হল। টাকার প্রচলন, বাজারে লেন-দেন, কাজকারবারের পরিচালনায় কারবারী হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির প্রবর্তনের ফলে সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনরভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। বৈপ্লবিক কল্পনাবিলাসিতা পরিহার করে আজ হয় তো স্বীকার করা সহজ যে, বিভিন্ন দেশে টাকার প্রবর্তন এবং বাজারে লেনদেনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে শুধু কয়েকজন পুঁজিপতির স্বার্থে নয়, বরং সমাজের প্রয়োজনে— অর্থাৎ, সামাজিক সম্পদের বিনিয়োগে হিসাব রেখে, প্রয়োজনের সঙ্গে সরঞ্জামের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলবার প্রয়োজনে। বাজারে কোনো দ্রব্যের মুল্য কখনও ন্যায্যতার সীমা ছাড়িয়ে যায়; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও, কোনো জটিল সমাজে লেনদেনের যন্ত্র হিসাবে বাজারের উপযোগিতা সাধারণভাবে স্বীকার্য। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা শিল্পের জাতীয়করণের

---

* প্রত্যাহারের পর লেনিন ইত্যাদিরা অবশ্য বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, এ-অবস্থা ওঁরা বৈপ্লবিক নীতির দিক দিয়ে গ্রহণ করেন নি, গৃহযুদ্ধের অবস্থার বিপাকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র। অথচ গৃহযুদ্ধ যখন প্রায় অবসিত সেই অবস্থাতেও এই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক করবার উদ্দেশ্যে অন্তত দুটি নূতন ডিক্রী জারি করা হয়েছিল; আর যতদিন গৃহযুদ্ধ চলছিল ততদিন বহু কম্যুনিস্ট নেতার বিবৃতিতে এ-কথাই বারবার শোনা গেছে যে, এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কম্যুনিস্ট বৈপ্লবিক আদর্শ দিনে দিনে মূর্তিমান হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে পোলানীর "The Logic of Liberty" পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত আলোচনা অবশ্য পাঠ্য।

সঙ্গে সঙ্গে এই প্রয়োজন লুপ্ত হয় না। সোভিয়েত দেশে অবশ্য স্ট্যালিনী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে টাকার ব্যবহার প্রচলিত থাকলেও দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা বাজারের মাধ্যমে, অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে, নির্ণয় করবার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে নি। কিন্তু পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে আজ শিল্পের জাতীয়করণ সত্ত্বেও বাজারের ভিত্তিতে অর্থনীতি চালু করবার ব্যবস্থা বহুদূর অগ্রসর; এবং সোভিয়েত দেশেও ভবিষ্যতে সেদিকে ঝোঁক দেখা দেওয়া অপ্রত্যাশিত নয়।

বাজারের অর্থনীতি থেকে একটি মূল শিক্ষা গ্রহণীয়। সামাজিক বিবর্তনের ধারায় বহু শতাব্দীর পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে যে-প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে ওঠে, নূতন যুগে, অর্থাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের ক্রটি চোখে পড়ে। যে-সব প্রয়োজন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও বিনা আড়ম্বরে সিদ্ধ করে চলে সাময়িক-ভাবে সে-সব প্রয়োজন থেকে দৃষ্টি ভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেদিকে ক্রটি সে দিকটাই হয় তো সমগ্র চেতনাকে অধিকার করে বসে। এ অবস্থায় মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্তনই সংস্কারপন্থিতা। রক্ষণশীলতা এখানে নিরর্থক, কারণ পরিবর্তন আবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী। বিপ্লববাদও প্রায়শ নিরর্থক; কারণ অহেতুক ক্ষয়ের পথে, নানা আতিশয্য অতিক্রম করে বিপ্লবী প্রয়াসও সেখানেই ফিরে আসে—সার্থক সংস্কারপন্থিতার ঝোঁক যেদিকে।

সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করে কেউ হয় তো বলবেন যে, আতিশয্য অতিক্রম করেও ঐ ব্যবস্থা যেখানে পৌঁছেচে, বা পৌঁছবার চেষ্টা করছে, তার সঙ্গে সংস্কারপন্থী সমাজবাদীদের সাধনার মৌলিক প্রভেদ আছে। সোভিয়েত দেশে কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথা,

শিল্পের ক্ষেত্রে সামগ্রিক জাতীয়করণ পাশ্চাত্ত্য সমাজবাদীদের কার্যক্রমে স্থান পায় না।

কিন্তু সোভিয়েত যৌথ চাষপ্রথা এবং শিল্পের সামগ্রিক জাতীয়করণ সমাজবাদী আদর্শের দিক থেকে প্রয়োজন অথবা বাঞ্ছনীয় কি না, এটাও বিচার্য। পূর্ব ইউরোপের যে-দেশেই যৌথ খামার থেকে চাষীদের বেরিয়ে আসবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, সেখানেই চাষীরা দলে দলে বেরিয়ে এসেছে। কম্যুনিস্ট যৌথ চাষপ্রথা শুধু-যে জোর জুলুমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তাই নয়, বাধ্যতার ভিত্তিতেই সাধারণত এ-ব্যবস্থা চালু রাখা যায়। বাধ্যতামূলক যৌথ চাষপ্রথায় উৎপাদনবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে একথাও আজ যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের কম্যুনিস্ট নেতারা খোলাখুলিভাবেই স্বীকার করছেন। চাষের ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানের স্থান আছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক চাষের যে-সমন্বয়ের কথা যুগোশ্লাভিয়ার নেতা টিটো কিছুদিন আগে বলেছেন সেই বাঞ্ছিত সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে সোভিয়েত দেশে নয়, বরং সংস্কারপন্থী হল্যাণ্ড-ডেনমার্কে।

শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা অনুরূপ কথাই বলা চলে। স্ট্যালিনী ব্যবস্থায় শিল্প-পরিচালনার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয়করণ অতিরিক্তভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, একথা অনেকেই আজ স্বীকার করছেন। এ-প্রসঙ্গে পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে যে নূতন চিন্তাধারা সরকারী দমননীতি সত্ত্বেও আশান্বিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। এই নূতন চিন্তাধারায় প্রধান প্রস্তাব এই যে: মুল শিল্পগুলিতে রাষ্ট্রের অব্যাহত কর্তৃত্ব থাকবে; কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ চাষপ্রথার অবসান ঘটবে; ছোট শিল্পে-ব্যক্তিগত পরিচালনা গ্রাহ্য হবে; শিল্পের পরিচালনায় শ্রমিক-দের, এবং রাষ্ট্রের উপর উপর জনসাধারণের, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে;

আর দেশময় চিন্তার দ্বন্দ্ব এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত হবে।* রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সাধারণ কাঠামোর ভিতর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গঠনের এই আদর্শ আজ কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর যতই মৌলিক সমর্থন লাভ করবে, ততই এই আন্দোলনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক ও সংস্কারপন্থী সাম্যবাদীদের সহযোগিতা ও ঐক্যের ভিত্তি প্রশস্ত হবে। পাশ্চাত্ত্য সাম্যবাদী ও পূর্ব ইউ-রোপের কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিভিন্ন পথে হয় তো অনুরূপ আদর্শের দিকেই ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে।

॥ তিন ॥

ঘটনার পর প্রায় যে-কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গেই উক্ত ঘটনার সামঞ্জস্য দেখানো কৌশলী তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু ঘটনার পূর্বে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞের যে-প্রত্যাশা তার সঙ্গে পরবর্তী তথ্যের তুলনাতেই ঐতিহাসিক তত্ত্বের যথার্থ পরীক্ষা ; এবং এই পরীক্ষায় যদি কোনো অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে তা হলে তদনুযায়ী আদিতত্ত্বের সংশোধন বিবেচক বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য।

---

* আপাত সদৃশ একটা ব্যবস্থাকে পুরনোপন্থী কম্যুনিস্টরা "উচ্চতর" সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগুবার পথে 'ট্যাকটিক্যাল' বা কৌশলমূলক ধাপ হিসাবে সমর্থন করে থাকেন। কিন্তু এই পুরনো পরিকল্পনার সঙ্গে নূতন প্রস্তাবের পার্থক্য মৌলিক। প্রধানত পূর্বে ইওরোপে উদ্ভূত এই নূতন চিন্তাধারা এখনও মস্কোর আশীর্বাদ লাভ করে নি।

ধনতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্ভাবনামাত্র নেই, মার্ক্সের আদি চিন্তায় এই ধারণা একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত স্বরূপ। গণতন্ত্রের অভাবে সাম্যবাদী আন্দোলন বিপ্লবমুখী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ধনতন্ত্রের যে-যুগে মার্ক্সীয় বিশ্বদর্শনের উৎপত্তি সে-যুগ, অন্তত মার্ক্সের জন্মভূমিতে, গণতন্ত্রের যুগ নয়। মার্ক্সের চিন্তায় বিপ্লববাদের প্রতিষ্ঠা তাই তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য নয়।

কিন্তু তত্ত্বকে পিছনে ফেলেই জীবন এগিয়ে চলে। মার্ক্সের যৌবনের ইউরোপের সঙ্গে তাঁর বার্দ্ধক্যের ইউরোপের পার্থক্য বিস্তর। আর এই প্রভেদের মূলে আছে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিস্তার।

১৮৪৮ সালের বিখ্যাত ইস্তাহারে মার্ক্স লিখেছিলেন :

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social relations."

অর্থাৎ, কম্যুনিস্ট আন্দোলনের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে একমাত্র হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক উচ্ছেদের ফলে। অথচ ১৮৭২ সালে আমস্টারডামে এক বক্তৃতায় মার্ক্সকে বলতে হল :

"We must take account of the institutions, customs and traditions of various countries, such as the United States and Great Britain—and if I knew

your institutions better I should perhaps add Holland —where the workers will be able to achieve their aims by peaceful means. But this will not be the case in all countries."

অর্থাৎ, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, আমেরিকায় শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ পথেই তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আরও প্রায় বিশ বৎসর পর এঙ্গেল্‌স লিখেছিলেন :

"With (the) successful utilisation of universal suffrage, an entirely new method of proletarian struggle came into operation." (The Class Struggles in France, 1848-50 ভূমিকা)

অর্থাৎ, গণভোটের প্রবর্তনের ফলে সর্বহারা মজুর শ্রেণীর সংগ্রামের একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ খুলে গেছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে শুধু গণভোটের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; এ-যুগেই ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলন সাংগঠনিক শক্তির দিক থেকে শৈশব অতিক্রম করে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে বলা চলে। পরবর্তী যুগের ক্রমবর্দ্ধমান সমাজ সংস্কারের দিকনির্দেশও পাওয়া যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই। উদাহরণত, ১৮৮৩ সাল থেকে ১৯১৩ সালের ভিতর জার্মানী ও ব্রিটেনে সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তনে রাষ্ট্রের তৎপরতা লক্ষণীয়।

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংস্কারপন্থী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি রুশ

বিপ্লবের পরোক্ষ ফল মাত্র, এ ধারণা যুক্তিসহ মনে হয় না। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে সংস্কারপন্থী আন্দোলন পশ্চিম ইউরোপে যে-আকৃতি ধারণ করেছে উনিশ শতকের শেষভাগে বা বর্ত্তমান শতকের গোড়াতেই তার মুল লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং যে-সাংগঠনিক শক্তির ফলে এই আন্দোলন তার লক্ষ্যের দিকে এগুতে পেরেছে তার ভিত্তিও এ-যুগেই স্থাপিত হয়েছে। একথাও আবার কখনও কখনও শোনা যায় যে, পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আধুনিক সংস্কারপন্থী প্রগতি সম্ভব হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায়। কিন্তু সংস্কারপন্থিতার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক ক্ষীণ, বহুক্ষেত্রে কাল্পনিক। আমেরিকায় অর্থনৈতিক সংস্কারের স্মরণীয় যুগ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের শাসনকাল। রুজভেল্টের আমেরিকাকে সাম্রাজ্যবাদী বলা চলে না। নরওয়ে-সুইডেন-নিউজীল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার সংস্কারপন্থী নীতি উল্লেখযোগ্য ঃ এসব দেশে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুপস্থিত। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ক্ষেত্রেও সমাজ সংস্কারে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এটলীর নেতৃত্বে, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের যুগে নয়, বরং সংকোচনের যুগে। আমেরিকা-ব্রিটেন-নরওয়ে সুইডেন-নিউজীল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকল দেশেই সংস্কারপন্থী নীতির মূলে যদি কোনো একটি শক্তি কার্যকরী হয়ে থাকে তবে তা ক্রমবর্দ্ধমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

গণতান্ত্রিক পথে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে সংস্কারপন্থী একটি নূতন যুগের আবির্ভাবকেই মার্ক্স পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন। তবু একথা বললে সম্ভবত ভুলই করা হবে যে, মার্ক্স জীবনের শেষ অধ্যায়ে বিপ্লববাদ ত্যাগ করেছিলেন। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক দর্শনের সঙ্গে বিপ্লববাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে-নূতন যুগের আবির্ভাব মার্ক্সের শেষবয়সের উক্তিবিশেষে প্রচ্ছন্ন সেই যুগের

বৈশিষ্ট্য তাঁর চেতনাকে স্পর্শ করলেও তাঁর দর্শনচিন্তার ভিত্তিতে স্থান পায় নি। মার্ক্সীয় দর্শন ও রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি ধনতন্ত্রের আদিপর্বের বিশেষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমিত। মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের ক্রম অবনতি, বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা, ধনতন্ত্রের আশু বিনাশ ইত্যাদি মার্ক্সীয় ভবিষ্যদ্বাণী ধনতন্ত্রের প্রথম যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধগম্য। আর অপেক্ষাকৃত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রত্যাশা বারবারই ব্যর্থ হয়েছে, এবং মার্ক্সবাদীদের যুক্তিকৌশল নিয়োগ করতে হয়েছে ঘটনার পরবর্তীকালে ঘটনার সঙ্গে থিওরীর সমঞ্জস্য প্রদর্শনের বক্র চেষ্টায়।

শুধু পাশ্চাত্ত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির ক্ষেত্রেই মার্ক্সীয় প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় নি; বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ব্যবস্থার বিবর্তনের সঙ্গেও মার্ক্সীয় প্রত্যাশার সঙ্গতি নেই। সোভিয়েত ব্যবস্থার যে স্বৈরাচারী অধঃপতন আজ ক্রুশ্চোভের প্রচারগুণে কম্যুনিস্ট মহলেও স্বীকৃত সে-অধঃপতন কি মার্ক্সবাদীরা আশা করেছিলেন? ধনতন্ত্র সম্বন্ধে "বুর্জোয়া" থিওরির অলস প্রত্যয় যেমন ঘটনাদ্বারা খণ্ডিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও মার্ক্সবাদী প্রত্যাশা কি তেমনই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নি? এ বিষয়েও তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের অসামঞ্জস্য চিন্তনীয়, এবং আদি তত্ত্বের সংশোধন প্রয়োজন।

এ প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্বের শুধু একটি দিক নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় শ্রেণীর সংজ্ঞা সম্পত্তির মালিকানা দ্বারা নির্দ্ধারিত: সম্পত্তিবানের সঙ্গে সম্পত্তিহীনের সংগ্রামই শ্রেণী সংগ্রাম। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের সঙ্গে আমলাতন্ত্র (bureaucracy) অথবা অত্যাচারপরায়ণ অন্য কোনো গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব শ্রেণীসংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত নয়, কারণ আমলা গোষ্ঠীর

ক্ষমতা মালিকানার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এখানে কয়েকটি কথা ভেবে দেখবার আছে। আগেই বলা হয়েছে যে, মালিকানা বলতে সম্পত্তি সংক্রান্ত কতকগুলি অধিকারের সমষ্টি বোঝায়, এবং এই অধিকারগুলি প্রয়োজনমত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মাধ্যমে সঙ্কুচিত করা যায় বা নানা সর্ত দ্বারা বেষ্টিত করা যায়। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাও শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমলাতন্ত্র যেখানে জনসাধারণের উপর অত্যাচারের একটি যন্ত্রবিশেষে পরিণত হয়েছে সেখানেও প্রয়োজন জনসাধারণের স্বার্থে আমলা-গোষ্ঠীর বিশেষ অধিকারগুলিকে গণস্বার্থরক্ষী সর্ত দ্বারা কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার লোপ পেলে আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার আর কোনো "বাস্তব" ভিত্তি থাকে না, সোভিয়েত দেশের অভিজ্ঞতার পর এ-ধরণের অলস থিওরীতে বিশ্বাস স্থাপন করতে আশা করি অনেকেই আজ ইতস্তত করবেন। যে-কথাটা এখনও পরিষ্কারভাবে বলা প্রয়োজন তা হ'ল এই যে, সম্পত্তির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার চেয়ে আমলা গোষ্ঠীর বিশেষ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সহজসাধ্য, এমন কোনো সাধারণ তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য নয়। গণ-তান্ত্রিক সমাজে দুই-ই সাধ্যায়ত্ত এবং শান্তিপূর্ণ সংস্কারের পথে সাধনীয়; যে-সমাজে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও সংগঠন দুর্বল, সেখানে দুই-ই দুঃসাধ্য এবং বিপ্লবের আশঙ্কা বাস্তব।

চীনদেশের কম্যুনিস্ট নেতা মাও ৎসে-তুং-এর একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাও বলেছেন যে, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (contradictions) থেকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থাই মুক্ত নয়; তবে ধনতান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতামূলক (antagonistic)—অর্থাৎ ধনতন্ত্রের বিলোপ ছাড়া এই দ্বন্দ্বের অবসান নেই—আর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বৈরিতাবিহীন (non-antagonistic)—অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর ভিতরই শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাদপ্রতিবাদের সমন্বয় সাধন সম্ভব, যদি-না প্রতিপক্ষ 'প্রতি-বিপ্লবী' হন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উদাহরণ হিসাবে মাও গণতন্ত্রের সঙ্গে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতার (centralism) এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারী আমলাগোষ্ঠীর বিরোধিতার উল্লেখ করেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ইতিহাসে বৈরিতাভিত্তিক উৎপাদনপ্রথার অন্তিম পর্যায়।* এদিকে সোভিয়েত ও অন্যান্য কম্যুনিস্টদেশে নেতৃস্থানীয়দের ভিতরে এবং আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের বিরোধ সন্দেহাতীতভাবে প্রকট। মার্ক্সীয় আদি তত্ত্বের সঙ্গে সোবিয়েত তথ্যের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই মাও ৎসে-তুং-এর বিবৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে, বা পূর্ববর্তী কোনো সমাজ ব্যবস্থায় অনুরূপ দ্বন্দ্ব ছিল, একথা তথ্য হিসাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা সম্ভব; কিন্তু ইতিহাসে ধনতন্ত্রই অন্তর্বিরোধসম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থার শেষ উদাহরণ, এ ধরণের সিদ্ধান্ত-বা ভবিষ্যদ্বাণীর কোনো তথ্যগত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, থাকা সম্ভবও নয়। এক প্রকার শূন্যগর্ভ বাক্যের মারপ্যাঁচে মার্ক্সীয় তার্কিক এই বাঞ্ছিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মোহ সৃষ্টি করতে পারেন বটে; কিন্তু এ ধরণের চিন্তায় ভবিষ্যৎ সমাজের গঠন এবং সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ে না, মোহই বাড়ে। অতীতের মত ভবিষ্যৎ সমাজেও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরিবর্তন দুই-ই থাকবে। এবং সমাজতন্ত্র বলতে যদি আমরা

*"The bourgeois relations of production are the last antagonistic form of the social process of production" —(Critique of Political Economy).

কোনো রূপরেখাহীন নিরাকার আদর্শ না-বুঝে বাস্তব একটি সমাজ-ব্যবস্থাই বুঝি তবে এই নূতন সমাজব্যবস্থাও একদিন পরিবর্তনের স্রোতে অন্তর্হিত হবে। কি-ধনতান্ত্রিক কি-সমাজতান্ত্রিক কোনো সমাজ ব্যবস্থাতেই গণতন্ত্রের অভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান আশা করা যাবে না। 'সাম্যবাদী' সমাজে নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আমলা গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্রের অভাবে 'বৈরিতামূলক' আকার ধারণ করাই স্বাভাবিক। 'সমাজ-তান্ত্রিক' হাঙ্গেরীতে জনসাধারণ ও শাসক গোষ্ঠীর ভিতর দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক আকার ধারণ করবার প্রধান কারণ এই যে, গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের পথ সেখানে খোলা ছিল না—আজও নেই।

সমাজতান্ত্রিক দেশেও গণতন্ত্রের প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনমত প্রকাশ ও সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অধিকার প্রয়োজন; এবং এই অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করলে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রও অত্যাচারের যন্ত্রে পরিণত হয়। বর্তমান ইতিহাসের এই সাক্ষ্য।

॥ চার ॥

ইতিহাসে 'ডায়লেকটিকস্'-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে দু-একটি কথা ছাড়া ইতিহাসবিষয়ক এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

পক্ষের যুক্তি প্রতিপক্ষ নস্যাৎ করে দেন; আর যুক্তির এই দ্বন্দ্বের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সমন্বয়ের নূতন সূত্র। চিন্তার এই দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনের ধাঁচে অনেকে সমাজ বিবর্তনকে কল্পনা

করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাদপ্রতিবাদের দ্বন্দ্বমূলক গতির সঙ্গে সমাজ বিবর্তনের গতি তুলনীয় এ ধারণা হয়তো বুদ্ধিজীবী মহলে আদৃত অন্যতম কুসংস্কারস্বরূপ।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা অন্যভাবেও বলা যায়। সমাজ বিবর্তনের গতি-প্রকৃতির নিকটতম উপমা হয়তো পাওয়া যাবে কোনো বিচ্ছিন্ন বাদপ্রতিবাদের দ্বন্দ্বমূলক ছন্দে নয়, বরং মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের যুগ-যুগব্যাপী ক্রমবৃদ্ধিতে। এবং যদিও কোনো কোনো দার্শনিক বিচ্ছিন্ন বাদপ্রতিবাদের দ্বন্দ্বের ধাঁচে চিন্তার ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন তবু একথাই হয়তো বাস্তব যে, জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসে শৈশব পেরোলেই, বাদপ্রতিবাদ চলে প্রধানত প্রান্তীয় প্রশ্ন নিয়ে। কোনো নূতন আবিষ্কার সাময়িকভাবে যতই যুগান্ত-কারী মনে হোক-না কেন এবং পুরনো তথ্যের উপর তাতে যতই নূতন আলোকপাত হোক না কেন, বাদপ্রতিবাদের চাঞ্চল্য যখন স্তিমিত হয় তখন একথাই সাধারণত স্বীকৃত হয়ে থাকে যে, ঐ বিশেষ আবিষ্কারটির ফলে জ্ঞানের প্রান্তদেশ কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হয়েছে অথবা ধৈর্যের সঙ্গে পূর্বে আবিষ্কৃত বিচ্ছিন্ন কয়েকটি সত্য একটি নূতন সংহতি লাভ করেছে।

সমাজের বিবর্তন অবশ্য সর্বাংশে জ্ঞানের বিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সমাজজীবনে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকার ফলে সামাজিক আলোড়নের আপাতনাটকীয়তা বেশী। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ও নেতৃত্বের যোগাযোগে বিপ্লব ঘটে থাকে। এবং এই বিশেষ সংযোগের বিশ্লেষণ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দায়িত্ব। কিন্তু বিপ্লব অনিবার্য, বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক দেশগুলির ইতিহাসের সাক্ষ্য এই দ্বান্দ্বিক সূত্রের স্বপক্ষে নয়। বরং এ কথাই সুস্পষ্ট যে, যে-দেশে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য যত দুর্বল সে-দেশের

প্রগতি প্রচেষ্টায় বিপ্লবের ভূমিকা তত প্রাধান্য লাভ করবার সম্ভাবনা। আরও সুস্পষ্ট এই যে, সমাজের সামগ্রিক বিবর্তনে ধারাবাহিকতার সূত্র যখনই খণ্ডিত হয় তখনই ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে সাময়িক আতিশয্যকে বহু ক্ষয়ক্ষতির মূল্যে সংশোধন করে আবারও সমাজ তার স্বাভাবিক বিবর্তনের কক্ষপথেই ফিরে আসে।

যুগ যুগ সঞ্চিত ঐতিহ্যের প্রান্ত স্পর্শ করেই সার্থক সমাজ সংস্কার। অবশ্য যুগ বিশেষে প্রান্তিক সংস্কারও একের পর এক এতো দ্রুত পরম্পরায় সাধিত হতে পারে যে, পারম্পর্য রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও—এবং শান্তিপূর্ণ পথে সমাজ প্রগতির ধারা চালিত হওয়া সত্ত্বেও—পরিবর্তনের একটা লয়গত বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা যায় না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করে 'বিপ্লব' শব্দটি হয়তো এখানে ব্যবহার করা চলে; তবে বিপ্লব ও ধারাবাহিকতা এক্ষেত্রে বিপরীতার্থক শব্দ নয়।

॥ পাঁচ ॥

গণতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য সমাজ ব্যবস্থার মূল, অর্থাৎ, মানবিক নীতিগুলিতে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন, এবং যুগ বিশেষের স্বার্থ অথবা অজ্ঞানতা প্রসূত যে সমস্ত ধারণায় এই মূল নীতি আচ্ছন্ন অথবা বিকৃত সেই ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা সমাজ সংস্কারকের অন্যতম কর্তব্য। নীতির বিচারে পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি, অথচ মূল নীতির প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও কার্যক্ষেত্রে ধাপে ধাপে পরীক্ষামূলকভাবে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি—সমাজ সংস্কারকের পক্ষে এ দুই-ই এক সঙ্গে আবশ্যক।

এ-বিষয়ে গান্ধিজীর উদাহরণ স্মরণীয়। গান্ধিজী আপোষ আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন বলে তাঁর প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে; কিন্তু মূল নীতির প্রতি তাঁর অটল বিশ্বস্ততা হয়তো সমালোচকেরাও স্বীকার করবেন।

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ-বিষয়ে আলোচনার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। এ-দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির বিরাট পরিকল্পনা চলেছে। সেই সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিও আমাদের আনুগত্য আমরা প্রকাশ করে থাকি। অথচ যে-দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকার প্রধান কার্যনির্বাহকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, সে-দেশে ক্ষমতার পৌনঃপুনিক হস্তান্তর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে—যদি-না শাসক-দল ও বিরোধী-দলের ভিতর কার্যক্রমের প্রভেদ সামগ্রিক এবং দুস্তর না-হয়ে প্রান্তিক হয়।

ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রশ্ন বাদ দিয়েও মূল সমস্যাটি আলোচনা করা যায়। অর্থনৈতিক দ্রুত উন্নতির জন্য দেশে উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ কলকারখানা, কলাকৌশল ইত্যাদি গড়ে তোলা প্রয়োজন। আয়ের একটা বড় অংশ ভোগ্যবস্তু মিটাবার কাজে ব্যবহার না করে উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণ করবার কাজে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কৃষকের আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের একটা অংশ যাতে খাদ্যবস্ত্রে ব্যয় না-হয়ে—জলসেচ, জমিতে সার, বিদ্যুৎ সরবরাহের আয়োজন ইত্যাদিতে প্রযুক্ত হয় সে-ব্যবস্থা করতে হবে। যে-পরিমাণে এসব কাজের খরচ সরকারকে বহন করতে হবে, সে-পরিমাণে চাষীর আয়ের উপর কর ধার্য করাও আবশ্যক হবে। চাষের ক্ষেত্রে যে কথা প্রযোজ্য শিল্পের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। বর্ধিত আয় যাতে অংশীদারদের মুনাফা এবং মজুরদের মজুরী বাবত ব্যয় হয়ে না যায়, একটা বড় অংশ যাতে শিল্পের প্রসারে খরচ করা হয়, সেজন্য

ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। সোভিয়েত দেশে একনায়কতন্ত্রের পথে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সেদেশে পুঁজিপতিশ্রেণীকে নির্মূল করা হয়েছে, শ্রমিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম যুগে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অবনত করা হয়েছে *, চাষীদের জোর-জুলুম করে যৌথ খামারে সংঘবদ্ধ করে তাদের উদ্বৃত্ত আয় বাধ্যতামূলকভাবে হস্তগত করা হয়েছে। জনসাধারণের পুঞ্জিত অসন্তোষ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে গণতান্ত্রিক বিরোধিতার অধিকারের অভাবে এবং স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে।

গণতান্ত্রিক সমাজে স্ট্যালিনী পথ অগ্রাহ্য। অথচ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী সহযোগিতা প্রয়োজন। বিরোধীদল যদি কৃষকের উপর কর ধার্য হলেই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করেন**, অথবা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না-রেখে দ্রুত মজুরী বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত চাপ দিতে থাকেন, অথবা পুঁজিপতিরা যদি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সহায়তামূলক সম্পর্ক রক্ষা না-করেন, তা হলে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াই সম্ভব। অপরপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারী নীতি ও কর্মপদ্ধতির সমালোচনারও প্রয়োজন আছে। এ অবস্থায় শাসকদল ও বিরোধী দল উভয়ই যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে দলীয় স্বার্থকে সংযত করতে প্রস্তুত থাকেন এবং আপনা-

---

* সোভিয়েৎ অর্থনীতি বিশারদ অধ্যাপক বার্গসন লিখেছেন :

"The industrial workers with an average money wage could by 10 p. c. less goods in 1952 than in 1928."

**বলা বাহুল্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কর অন্যায় হতে পারে এবং তার বিরোধিতাও প্রয়োজন হতে পারে।

পন নীতিতে অবিচলতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতা সত্ত্বেও কয়েকটি প্রান্তীয় প্রশ্নের উপর বাদ-প্রতিবাদ নিবদ্ধ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হন, তবেই সমাজ পরিবর্তনের এই যুগে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এশিয়া ও আফ্রিকার যে দেশগুলিতে আজ গণতন্ত্রের নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সে-দেশগুলিতে অবস্থার জটিলতার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। এদেশগুলির প্রত্যেকটিই ধর্ম, জাতি অথবা ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ব্যক্তির পরিচয় এখানে গোষ্ঠীর পরিচয়ে; ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার চেয়ে সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্যই প্রবল। এ অবস্থায় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে বিভিন্ন দলের শক্তিশালী হবার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। দলীয় দ্বন্দ্ব এখানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বাহনে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। দেশ বিভাগের আগে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্রমশই হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণতি লাভ করছিল। স্বাধীনতা-লাভের পর বর্ণ (caste) এবং ভাষার ভিত্তিতে বিরোধ—বিশেষত হিন্দী যাদের মাতৃভাষা নয় তাদের বিরোধ—প্রবল হয়ে উঠেছে। নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা আজ অনেকের কাছেই লজ্জার বিষয়। কিন্তু রাজনৈতিক আদর্শের মুখোশ পরা সাম্প্রদায়িক কলহে এখনও উৎসাহের অভাব নেই। দলীয় রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির আপোষহীন তিক্ততা সাম্প্রদায়িক বা উপজাতীয় কলহের সঙ্গে যুক্ত হলে গৃহযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের পরিণামস্বরূপ এক-নায়কতন্ত্রের দিকেই দেশ এগিয়ে যাবে। এ ভয় যুদ্ধোত্তর ব্রহ্ম, মালয়, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ইত্যাদি সকল দেশেই অল্পবিস্তর বর্তমান।

যিনি গণতান্ত্রিক, তিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্য ও কল্যাণের পথ

ব্যক্তির নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়; কোন যাজক গোষ্ঠী বা পেশাদারী দীক্ষাদাতা ব্যক্তির মুক্তি এনে দিতে পারেন না। গণতান্ত্রিক আরও বিশ্বাস করেন যে, পরস্পরবিরোধী আংশিক সত্যের দ্বন্দ্ব ও যোজনার ভিতর দিয়েই বিচিত্র সত্যকে জ্ঞানে ও ব্যবহারে পূর্ণতররূপে লাভ করা যায়। কিন্তু দলীয় বিরোধ যখন ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিকে উম্মুক্ত করে না, বরং ব্যক্তির মুক্তি ও সামাজিক কল্যাণ উভয়কেই ছদ্মবেশী সাম্প্রদায়িক আনুগত্যে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হয়, তখন গণতন্ত্রের মূল আদর্শকে রক্ষা করার জন্যই বিকল্প বিন্যাসের কথা ভাবতে হয়। পাশ্চাত্য দলীয় রাজনীতিতেই গণতন্ত্রের চরম বিকাশ, একথা মনে করবার কারণ নেই। বরং দলোত্তর রাজনীতিই গণতন্ত্রের উচ্চতর আদর্শ। সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবাধ অধিকার অবশ্য গণতান্ত্রিক সমাজে মৌলিক, এবং যতদিন শাসক দলের রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার স্বীকৃত ততদিন বিরোধী দলের তুলনীয় অধিকারও অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু গণতন্ত্রের মৌল সর্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা, দলীয়তা নয়। দলোত্তর গণতন্ত্রে আজকের দল-গুলি নির্বিশেষে বে-সরকারী সমিতি বা 'ক্লাবে'র সমপর্যায়ভুক্ত হবে; নির্বাচনকালে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরিচয় হবে তাঁদের ব্যক্তিগত যোগ্যতায় ও মতামতে; বিধানসভায় তাঁরা স্বীকৃত হবেন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন গণপ্রতিনিধি হিসাবে যাঁদের বাগ-বিতণ্ডা ও যুক্ত মন্ত্রণার ভিতর দিয়ে দেশের বিধান প্রণীত হবে। আর এই বিধান অনুযায়ী কার্য নির্বাহ হবে দলনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের সাহায্যে। নির্দলীয় রাজনীতির এই আদর্শ আজ অভিনব, এমন কি কাল্পনিক মনে হতে পারে; মনে হতে পারে যে, বিধান সভা যেখানে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র সেখানে পরস্পরসম্বন্ধ কার্যকরী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অসম্ভব। কিন্তু সামাজিক সম্বন্ধতার ভিত্তি দলীয়তা নয়।

পরিবারে, পঞ্চায়েতে, পৃথিবীর বিদ্বজ্জন সভায় যে-নীতি দ্বারা যৌথ জীবন দীর্ঘকাল যাবত পরিচালিত হয়ে এসেছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনায় সে-নীতি কার্যকরী না হবার কোনো মৌলিক কারণ নেই। আর গণতন্ত্রের এই বিকল্পরূপ প্রতিষ্ঠানগতভাবে স্বীকার করে নিতে যদি বাধা থাকে তা হ'লে অন্ততঃ একথা স্বীকার করতেও কি বাধা আছে যে, দলীয় রাজনীতিও সফল হতে পারে শুধু সেই সমাজেই, যেখানে গণতন্ত্রের দলোত্তর ঐতিহ্য দলীয় বিরোধকে একটি অনুক্ত মাত্রার ভিতর নিয়ত সংযত রাখছে! যুক্তি, সহনশীলতা এবং সমাজকল্যাণের আদর্শ সমন্বিত গণতন্ত্রের এই দল-নিরেপেক্ষ ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করা গণতান্ত্রিক-মাত্রেরই কর্তব্য। শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রগতির অন্য পন্থা নেই।

সোভিয়েত কম্যুনিজম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

॥ এক ॥

ক্রুশ্চোভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যে চেহারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে।*

গোড়ায় কয়েকটি তথ্য স্মরণ করা যাক।

নিজের নীতি অথবা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা স্ট্যালিনের অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে পরিপার্শ্বস্থ সকলের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা নাকি তাঁর মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়।** শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন হাজার হাজার নিরপরাধ কর্মী। কাল্পনিক অভিযোগের বাস্তবতা প্রমাণে এবং মিথ্যা স্বীকারোক্তি

---

* ক্রুশ্চোভের যে গুপ্ত বিবৃতি মার্কিণ পররাষ্ট্রদপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়, ব্রিটিশ ও অন্যান্য কম্যুনিস্টদল তাকে ভিত্তি করেই দলীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেন। "প্রাভ্‌দা" ও অন্যান্য সরকারী পত্রিকায় প্রকাশিত পরবর্তী বিবৃতির সঙ্গেও এই আদি বিবৃতির সামঞ্জস্য আছে।

** কম্যুনিস্টশাসিত পোল্যাণ্ড থেকেও এই মর্মে অভিযোগ আনা হয়েছে। "How monstrous and pathologically suspicious must have been the thoughts of a man who could suppose that numerous members of the Central Committee were enemies or imperialist agents." (Radio Warsaw, 29th March, 1956). "Many honest activists who opposed Stalin in various matters fell victim to repression. Methods

আদায়ে সোভিয়েত পুলিশবাহিনী অনন্যসাধারণ কুশলতা অর্জন করে। অভিযুক্তের মুখ থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের সোভিয়েত প্রণালী যেমনই অব্যর্থ তেমনই ভয়াবহ। এই প্রণালীতেই স্ট্যালিনের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা 'সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচর' বলে প্রমাণিত হয়ে যান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কম্যুনিস্টদলের কেন্দ্রীয় সমিতির ১৩৯ জন সভ্য ও সভ্য-প্রার্থীদের ভিতর ৯৮ জনকে গুলি করে মারা হয়; এঁদের অধিকাংশই নিহত হন ১৯৩৭-৩৮ সালে। এ-অবস্থায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে স্ট্যালিনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এসব কথা অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন নয়, অন্তত তাঁদের কাছে, যাঁরা সোভিয়েত স্বৈরাচারের প্রকৃতি মোহমুক্ত মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সোভিয়েত ব্যবস্থা এবং স্ট্যালিনের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত কাহিনীই কম্যুনিস্ট প্রচারে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট নেতা হ্যারি পলিটের একটি প্রাক-ক্রুশ্চোভ বিবৃতি ধরা যাক। ১৯৫৩ সালে ৭ই মার্চে "ডেইলি ওয়ার্কারের" পাতায় পলিট ভক্তি গদ-গদ ভাষায় বলেছেন, 'স্ট্যালিন, ইতিহাসে যিনি একটি নূতন স্বর্ণময় অধ্যায় যোগ করে গেলেন, যাঁর ভাস্বর কীর্তি অবিনশ্বর···যিনি স্বৈরাচারী কখনই ছিলেন না, অনুশাসন প্রয়োগে কখনও প্রবৃত্ত হন নি, সর্বক্ষণ ব্যগ্র ছিলেন

---

of provocation were used ; false accusations were forged ; abuses took place during investigations in order to bring about the condemnation of the accused." (Trybuna Ludu, 28 March, 1956).

অপরের বক্তব্য অনুধাবন করতে, অপরের মতামতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে…।'* হ্যারি পলিট কি জ্ঞাতসারে অসত্য প্রচার করছিলেন? —হয়তো। অথবা হয়তো সোভিয়েত ভক্তিতে তাঁর বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয়েছিল। কম্যুনিস্ট আন্দোলনে বস্তুবাদের সঙ্গে ভক্তিরসের, আদর্শ-ধর্মিতার সঙ্গে নীতিশূন্যতার আশ্চর্য সংমিশ্রণ এ-যুগের অন্যতম বিস্ময়কর ব্যাপার।

ক্রুশ্চোভের বিবৃতিতে স্ট্যালিনী অত্যাচারের অন্যান্য যে-সব দিক প্রকাশিত হয়েছে তা-ও লক্ষ্য করবার যোগ্য। এখানে শুধু দু'একটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট। বিবৃতিতে প্রকাশ:

"All the more monstrous are the acts whose initiator was Stalin and which are rude violations of the basic Leninist principles of the nationality policy. Thus, already at the end of 1943 a decision was taken and executed concerning the deportation of all the Karachai from the lands on which they lived. In the same period, at the end of December, 1943, the same lot befell the whole population of the Kalmyk Autonomous Republic. In March, 1944, all the Chechen and Ingush peoples were deported and the Chechen-Ingush Automomous Republic was liquidated...The Ukrainians avoided meeting this

* "Stalin, who has written golden pages in world history, whose lustre time can never efface...Never the dictator, never to lay down the law, always eager and willing to listen, to understand another's point of view…

fate only because there were too many of them and there was no place to which to deport them."

অর্থাৎ, জাতীয় অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের নীতি মুখে নিয়ে কম্যুনিস্টরা যখন মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র প্রগতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ, সোভিয়েত দেশে তখন একে একে বহু ছোট ছোট জাতি ও গোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করবার অমানুষিক জুলুম চলেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্ট্যালিনী জুলুম বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সমান ভয়াবহ। বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের এই অধিনেতাটি শুধু ভবিষ্যতকে নয়, অতীতকেও নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ঢেলে সাজাতে চেয়েছেন। বিপ্লবের আদিযুগের ইতিহাস নূতন করে লেখা হলো স্ট্যালিনের নির্দেশে, তাতে সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়ে ঘোষিত হলো স্ট্যালিন-মাহাত্ম্য।*

॥ দুই ॥

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা হিসাবে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বৈরিতা ও অবরোধনীতির উল্লেখ করা হয়। বিপ্লবের পর শিশুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ইতিহাস সুবিদিত। আর তিরিশের যুগের মাঝামাঝি

* "In speaking about the events of the October Revolution and about the Civil War, the impression was created that Stalin always played the main role, as if everywhere and always Stalin had suggested to Lenin what to do and how to do it."

নাৎসী জার্মানীর যুদ্ধায়োজন যে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্গত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল একথাও অনস্বীকার্য। তবু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈরনীতির সাহায্যে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা শুধু আধা-সত্যের মর্যাদাই পেতে পারে। স্ট্যালিন কম্যুনিস্টদলের কর্মাধ্যক্ষ হবার আগেই ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যবাদী উগ্র-পন্থীরা শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে মাথা নত করে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের নীতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। বিশের দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত দেশে দুর্ভিক্ষের সময় বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার সাহায্য নূতন বন্ধুত্বের সুরই ব্যক্ত করেছে। বিশের দশকের মাঝামাঝি লোকার্ন চুক্তি এবং অন্যান্য ঘটনার ভিতর দিয়ে আন্তর্জাতিক শান্তির সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়েছে। এদিকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে; অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। সংক্ষেপে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপদের সম্ভাবনা এ-যুগে বৃদ্ধি পায় নি, হ্রাস পেয়েছে। অথচ এ-যুগেই স্ট্যালিনী একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েছে। এ-যুগেই গুপ্ত পুলিশবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে; সোভিয়েত আইন ক্রমশ কঠোর হয়ে স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে; আর দলের ভিতর বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তিরিশের দশক যখন শুরু হোলো হিটলার তখনও ক্ষমতায় আসেন নি, বরং স্ট্যালিনের ১৯৩০ সালের বক্তৃতায় জার্মানীতে কম্যুনিস্ট-বিজয়ের আশু সম্ভাবনাই ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রে ততদিনে স্ট্যালিনী জুলুমের ভিত্তি দৃঢ়ভাবেই প্রস্তুত হয়ে গেছে। ক্রুশ্চোভের বিবৃতির একটি অংশ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়:

"Stalin put the party and the N.K.V.D. up to the use of mass terror when the exploiting classes had

been liquidated in our country and when there were no serious reasons for the use of extraordinary mass terror."

দেশের ভিতর যখন বিরুদ্ধ শ্রেণী নির্মূল, অথবা প্রায় নির্মূল, এবং হিংসাত্মক নীতি প্রয়োগের অন্যান্য কারণও যখন অনুপস্থিত তখনই স্ট্যালিন কম্যুনিস্ট দল ও পুলিশবাহিনীকে দেশময় সন্ত্রাসনীতির সমর্থনে ব্যবহার করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি বার্টাম ডি. উলফের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। উলফ লিখেছেন :

In the early days of civil war, intervention and and famine, when the state was most in danger, art was most free. The state did not begin to dictate in detail until the danger had passed, just as the Menshevik Party was not finally outlawed until the Civil War and the Polish War were safely over...... In the war years of 1939-45, when the state was once more in danger and its very survival was in question, there was a new era of comparative liberalism. Then censorship relaxed and poets like the gentle Akhm-a tova, silenced for more than twenty years, were given a chance to be published. But no sooner was the danger safely past than the Soviet dictators began a renewed war on their own people. The year 1946 saw Zhdanov delivering his declaration of war on Soviet artists, writers and musicians in Stalingrad.

Thus the relation between danger to the State and total terror is just the opposite of what is generally imagined." (Six Keys to the Soviet System, pp. 99-100)

সোভিয়েত আমলে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে বিশেষভাবে সেই যুগে নয় যখন রাষ্ট্র বিপন্ন, বরং সেই যুগে যখন রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত বিপন্মুক্ত।

॥ তিন ॥

অর্থাৎ, রুশদেশে স্বৈরাচারী শাসনের অভ্যুত্থানের কারণ খুঁজতে হবে অনেকাংশে সোভিয়েত ব্যবস্থায় ও কম্যুনিস্ট নীতির মৌলিক গলদে।

সাম্যবাদীরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দু'টি গলদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যে-সমাজে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বিরাট সেখানে টাকার জোর সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। তা ছাড়া পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন প্রত্যক্ষ ও প্রাত্যহিক যোগাযোগ নেই; শিল্পের ক্ষেত্রেও সাধারণ শ্রমিকের মতামত শিল্প-পরিচালনায় প্রতিফলিত হবার সন্তোষজনক উপায় নেই। এদিক থেকে সোভিয়েত ব্যবস্থায় একটা নূতন সম্ভাবনা নিহিত ছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের স্থানীয় সমিতির ভিতর দিয়ে সাধারণ কর্মীর মতামত শিল্পের ও রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করবে, গণতন্ত্র গণস্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই আশা সোভিয়েত রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের যুগে বহু আদর্শবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছে।

এই আশা কেন ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো, শ্রমিক-কৃষকের সমিতি কেন সাম্য-স্বাধীনতার নূতন যুগের সূচনা না করে স্ট্যালিনী স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হলো, এ প্রশ্ন আজকের যুগে অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর থেকে এ প্রশ্নের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ, যাঁকে লেনিন তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছিলেন মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। রুশবিপ্লবের অল্পকাল পরেই লুক্সেমবুর্গ, তীক্ষ্ণ ভাষায় তাঁর মত প্রকাশ করেন:

"With the repression of political life in the land as a whole, life in the Soviets must also become more and more crippled...

...Without unrestricted freedom of press and assembly, without a free struggle of opinion, life dies out in every public institution in which only the bureaucracy remains as the active element."

শ্রমিক-কৃষকের সমিতি গণতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে সেই দেশেই যে দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ণ, সরকারী নীতিকে সমালোচনা করার সুযোগ অবারিত। বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার যেখানে অবলুপ্ত, সেখানে সরকারী শাসনযন্ত্রই সর্বকর্তৃত্বময়। আর সর্বপ্রকার গণসমিতিই সেখানে শাসনযন্ত্রের করায়ত্ত। শ্রমিক ও কৃষক-সংগঠন সেক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বাহন না হয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশে গণপীড়নের যন্ত্রে পরিণত হয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে কম্যুনিস্টদল আজও একমেবাদ্বিতীয়ম্। বিরোধীদল গঠনের স্বাধীনতা সে-দেশে অনুপস্থিত। এ বিষয়ে ক্রুশ্চোভের মতবাদ লেনিন তথা স্ট্যালিনেরই অনুগামী। সোভিয়েত সরকারী বিবৃতিতে বারবারই একদলীয় শাসনের সমর্থন করা হয়েছে।

এ-সম্পর্কে কম্যুনিস্টদলের যুক্তি মার্ক্সবাদের উপর নির্ভরশীল। বিরোধীদল বিরোধী শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিফলন। সাম্যবাদ যে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, উৎপাদনের যন্ত্র যে সমাজে রাষ্ট্রের করায়ত্ত, সে দেশে শ্রেণীবিরোধের বাস্তব ভিত্তি অনুপস্থিত। কাজেই সাম্যবাদী দেশে বিরোধীদল নিষ্প্রয়োজন।

উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পেলেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব লোপ পায় না। যতদিন বণ্টনের প্রশ্ন আছে ততদিন স্বার্থের সংঘাতও সম্ভব। আর যেখানেই কাম্যবস্তু সীমায়িত, অর্থাৎ অশেষ নয়, সেখানেই বণ্টনের প্রশ্ন অনিবার্য। যে-সমাজে উৎপাদনযন্ত্র সমাজের সম্পত্তি বলে স্বীকৃত, সে-সমাজেও আয়ের বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর ভিতর স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়। ক্ষমতা নিয়ে সংঘাতও একই কারণে। ক্ষমতা এমন বস্তু যে, একের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে অন্যের ক্ষমতা তাতে সংকুচিত হবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ, মানুষের স্বার্থের সংঘাতের মূলে আছে কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা। অর্থ, ক্ষমতা ইত্যাদি যতদিন মানুষের প্রধান কাম্য সামগ্রী হয়ে থাকবে ততদিন সমাজে স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য। আর উৎপাদনযন্ত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই ক্ষমতা অথবা অর্থের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা সুশমিত হবে, এমন মনে করবার কারণ নেই।

স্বার্থের বিরোধ নিরপেক্ষভাবেও মতবিরোধের অন্যতম কারণ, জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই ক্রমশ সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা দল অপর সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা দলের মতামতকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহলে এ সিদ্ধান্তের ফলে মিথ্যাকেই দীর্ঘায়ু করা হবে।

কাম্যবস্তুর সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার ফলে মানুষের যে

স্বার্থের সংঘাত, সে সংঘাত বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু ধনতন্ত্রের বিলোপের সঙ্গে এই সংঘাতের বিলোপের কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। সমাজ যেখানে অচল, অনড় এবং সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতা যেখানে কম সেখানে অবশ্য পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সর্ব-স্বীকৃত কোন প্রাচীন নীতির অবলম্বনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অনুচ্চার থাকতে পারে। কিন্তু সচল ও জটিল কোন সমাজব্যবস্থায় বিরোধ উচ্চারিত হবে এটাই স্বাভাবিক। সে-অবস্থায় বিরোধী মতবাদের অনুপস্থিতিই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। যে সমাজে বিরোধী মতবাদ সংগঠনের অধিকার অস্বীকৃত সে সমাজে শাসকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ অনিবার্য ; এবং সেই কেন্দ্রীভূত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সমর্থনে নানা মিথ্যা মতবাদ সেখানে প্রশ্নাতীত সত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রত্যাশিত। স্ট্যালিনের শাসনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং ইতিহাসের পুনর্লিখন সমাজের উক্ত অন্তর্নিহিত ঝোঁকের একটি চমকপ্রদ অভিব্যক্তি মাত্র।

॥ চার ॥

কম্যুনিস্ট মতবাদীরা বলে থাকেন যে, সাম্যবাদী সমাজে বিরোধীদল সংগঠনের স্বাধীনতা নিষ্প্রয়োজন। বিরোধী মতাবলম্বীরা কম্যুনিস্ট-দলের ভিতর থেকেই তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করবেন।

কিন্তু কম্যুনিস্টদলের ভিতর থেকে বিরুদ্ধবাদীরা মতপ্রকাশের অধিকার কতটুকু পেতে পারেন? কম্যুনিস্ট নীতির মৌলিক সমালোচনা সোভিয়েত দেশে নিষিদ্ধ। এ-বিষয়ে সরকারী বিবৃতিতে

কোন অস্পষ্টতা নেই। ১৯৫৬ সালে ৪ঠা এপ্রিল 'প্রাভদা' পত্রিকায় বলা হয়েছে :

"Communist Party rules give every Communist the right to discuss all questions of party freely. But...the party cannot permit the freedom to discuss problems to be interpreted as the freedom to propagate views alien to the spirit of Marxism-Leninism because this contradicts the provisions of party rules and party principles."

অর্থাৎ কম্যুনিষ্টদলের নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত দলগত প্রশ্নই সভ্যদের স্বাধীনভাবে আলোচনা করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী কোন মত প্রচার করবার অধিকার কারো আছে, কারণ দলের নীতি এতে খণ্ডিত হয়।

একদলীয় শাসনের সমর্থকদের একটি কথা বিবেচনা করতে বলি। তাঁরা কি মনে করেন যে তাঁদের মতবাদ অন্য কোন দলের ভিতর থেকে তাঁরা কার্যকরীভাবে প্রকাশ করতে পারতেন? পারতেন না বলেই কি তাঁরা স্বতন্ত্রদল গঠন করেন নি? যে-কারণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োজন, সেই একই কারণে মত সংগঠনের অধিকারও অপরিহার্য। যে-সমাজে মত সংগঠনের স্বাধীনতা নেই সে-সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ নয়। বিরোধী মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠিত সরকার শুধু এই একটি অঙ্গীকারই দাবি করতে পারেন, যে, মত প্রচারে তাঁরা গণতান্ত্রিক পথই অবলম্বন করবেন, হিংসাত্মক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে প্রয়াসী হবেন না, আর মত প্রচারের যে অধিকার

তাঁরা দাবি করেন প্রতিপক্ষেরও সেই অধিকারকে তাঁরা সম্মান করে চলবেন। এই সর্ত যাঁরা খণ্ডন করবেন শুধু তাঁদেরই গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া যেতে পারে।

যতদিন শাসকদল সংগঠিত, ততদিন বিরোধী দলের গণতান্ত্রিক সংগঠনের অধিকার স্বাধীন সমাজব্যবস্থার অন্যতম মৌল সর্ত। এক-দলীয়ত্বের সমর্থনে সোভিয়েত শাসকবর্গ বলে থাকেন যে, রুশ দেশে কম্যুনিস্টবিরোধীদল বিদেশী পুঁজিপতিদের সাহায্য লাভ করবে। একই যুক্তি আমরা ফ্যাসিষ্টদের মুখেও শুনেছি ঃ কম্যুনিষ্টদলকে বে-আইনী করা দরকার, কারণ কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিদেশী সাহায্যে পুষ্ট। এ-ধরণের যুক্তি মারাত্মক আধা-সত্য। শুধু বিদেশী সাহায্যকে পুঁজি করে কোন দলই জনসমর্থন লাভ করতে পারে না। বিদেশী সাহায্য যাতে কোন দলের হাতে বে-আইনীভাবে পৌঁছতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা সঙ্গত। সতর্কতা সত্ত্বেও যে-পরিমাণ সাহায্য বিপক্ষদলের হাতে পৌঁছতে পারে তা নিয়ে আজকের যুগে কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারকে, এমন কি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথেও উল্‌টে দেওয়া যায় না। এ-কথা সোভিয়েত সরকারের অজানা নেই। বিদেশী ষড়যন্ত্রের নামে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতার অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার চিরকালীন অভ্যাস।

সাম্যবাদী সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণী অনুপস্থিত। সে-সমাজে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের সমালোচনা করে যদি কোন দল জনসমর্থন লাভ করেন তবে একথাই মনে করতে হবে যে এই সমর্থনের পিছনে টাকার জোর প্রধান নয়, যুক্তির জোরই হয়তো প্রধান, অন্তত জনগণের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে বিরোধী মতবাদের কোথাও কোন গভীর যোগসূত্র আছে। বিরোধীদলের দুর্বল যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করবার জন্য সোভিয়েত দেশে কম্যুনিষ্টদলের তো সুযোগের অভাব

হবার কথা নয়। তাহলে বিরোধীদলকে সংগঠনের স্বাধীনতা দিতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ অসম্মত কিসের ভয়ে ?

এ-কথা বলা হয়েছে যে, সোভিয়েত দেশে বিরোধীদল গঠনের কোন দাবি নেই। ষ্ট্যালিনী অত্যাচারের যুগেও এ-কথাই আমরা বারবার শুনেছি। কিন্তু বিরোধীদল গঠনের দাবি যদি উঠে না থাকে সেদিন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী যদি ধ্বনিত না হয়ে থাকে, তবে এ-সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, ভয়ে মানুষ স্তব্ধ হয়েছিল। লেনিনী আমলে এই দাবি শোনা গিয়েছিল। সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে এই দাবি আবারও শোনা গেছে ; আর একই সঙ্গে শোনা গেছে এই দাবিকে স্তব্ধ করে দিতে সরকারী হুঙ্কার।

চীনদেশে অবশ্য কম্যুনিস্ট ছাড়া আরও কয়েকটি দল আছে। কিন্তু অন্যান্য দলগুলি কম্যুনিস্ট দলেরই আজ্ঞাবাহী। রাজনৈতিক বিরোধিতার অধিকার সোভিয়েত দেশের মত চীনদেশেও অনুপস্থিত। সোভিয়েত অথবা চীনদেশে যদি গণতন্ত্র ভবিষ্যতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সে-গণতন্ত্রের রূপ পশ্চিমী গণতন্ত্রেরই অনুরূপ হতে হবে, এ-কথা আমরা বলছি না। গণতন্ত্রের অন্যতর রূপ সম্বন্ধে দু'য়েকটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে প্রবন্ধের শেষ অধ্যায়ে। কিন্তু চীন অথবা সোভিয়েত দেশে আজ যে-ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে সরকারী মতের প্রকাশ্য, মৌল সমালোচনা শান্তিপূর্ণ উপায়েও সম্ভব নয় বলেই একে গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না।

পাঁচ

বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে আজ এ-কথা পরিষ্কার যে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় বিপ্লবের পথে নূতন কোন দেশে ক্ষমতা হস্তগত করবার চেষ্টায় একদিকে বিপ্লবের অসাফল্য, অন্যদিকে বিশ্বশান্তির ব্যাঘাত এবং ফ্যাসিজমের উদ্ভবের সম্ভাবনাই প্রবল। শান্তিপূর্ণ পথে ক্ষমতা হস্তগত করতে হলে দেশের অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন। অথচ সোভিয়েত শিবিরের বাইরে কম্যুনিস্ট দল কোন দেশেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। অর্থাৎ, অন্যান্যদলের সঙ্গে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে 'যুক্তফ্রণ্টের' পথেই শুধু কম্যুনিস্টদের পক্ষে আজ ক্ষমতালাভ করা সম্ভব। ক্ষমতা করায়ত্ত হলে 'যুক্তফ্রণ্টের' অন্যান্যদলের স্বাধীন অস্তিত্ব অবশ্য অচিরেই লোপ পাবে।

বিপ্লবের পথে ক্ষমতা হস্তগত করা যাবে না, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই কম্যুনিস্টদল আজ এ-সিদ্ধান্তে পোঁছেছেন। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কম্যুনিস্টদল কি ভবিষ্যতে এ-সিদ্ধান্তেও পোঁছতে পারবেন যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন না করে অন্যান্য গণতান্ত্রিকদলের সহযোগিতা লাভ করা যাবে না? কম্যুনিস্টদল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন একটা ঘোষণা অবশ্য আজকাল বারবারই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু গণতন্ত্র সম্বন্ধে কম্যুনিস্টদলের নূতন প্রস্তাব বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা নির্ভর করছে দু'টি প্রশ্নের দ্ব্যর্থবিহীন উত্তরের উপর।

প্রথম প্রশ্ন, সোভিয়েত দেশের একদলীয় শাসনের সুস্পষ্ট সমালোচনা উচ্চারণ করতে কি কম্যুনিস্টদল রাজী আছেন? এ-দেশের কম্যুনিস্টদল যতদিন সোভিয়েত একদলীয় শাসনের সমালোচনায় পরাঙ্মুখ ততদিন এ-সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে, ক্ষমতা হস্তগত হ'লে এঁরাও

এদেশে নির্বিরোধ শাসনের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবেন। এমন কোন কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন যে-কারণে সোভিয়েত দেশে বিরোধীদলের স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত হয়েও কম্যুনিস্টশাসিত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপজ্জনক বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, লেনিনবাদ ত্যাগ করতে কি কম্যুনিষ্টরা রাজী আছেন ?

সোভিয়েত দেশে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং লেনিন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের ভিতর ধনিকশ্রেণী নির্লোপ হয়েছে ; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত দেশ আজ আর দুর্বল, একক রাষ্ট্র নয়। ধনতান্ত্রিক অবরোধের কথা আজ অবাস্তব। কম্যুনিষ্ট কাগজেও একথা স্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কম্যুনিষ্টদের মুখপত্র "মার্ক্‌সিষ্ট কোয়ারটার্লি" কাগজে বর্তমান বৎসরের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"The destruction of fascism...cleared the way for the fundamental shift in the balance of world forces which took place during the first decade after the war. Governments under Communist leadership were established in Eastern Europe and China...The capitalist encirclement of an isolated Soviet Union was ended."

প্রায় একই মর্মে বিবৃতি সোভিয়েত নেতাদের ভাষণ থেকেও উদ্ধৃত করা সম্ভব। অর্থাৎ, চীনদেশে ও পূর্ব ইওরোপে কম্যুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন

অনস্বীকার্য। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক এই বিরাট পরিবর্তনের পর লেনিনবাদ ও লেনিন-প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্র কায়েম রাখবার স্বপক্ষে সুযুক্তি অবশিষ্ট নেই।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্ক্স-লেনিনের মৌল শিক্ষাও আজ বহু পরিমাণে অচল। রাষ্ট্র শ্রেণী-সংগ্রামে হাতিয়ারমাত্র, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মজুর শ্রেণীর বিপক্ষে ধনিকশ্রেণীর হাতিয়ার, এ-কথা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের উপর মজুর অথবা জনসাধারণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ধনিকশ্রেণী কখনই হতে দেবে না, বরং হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে রাষ্ট্র-ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে, লেনিনবাদের এটাই অন্যতম মূল শিক্ষা। শ্রমিকশ্রেণী যতই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও দলবদ্ধ হোক-না কেন, রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে ধনিকশ্রেণী, অথবা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী, সেই সংকটের মুহূর্তে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে নগ্ন, হিংসাত্মক দমননীতি অবলম্বন করবে, এই তত্ত্বই লেনিনের উত্তরাধিকারসূত্রে কম্যুনিষ্টরা এতকাল প্রচার ও বিশ্বাস করে এসেছেন, এবং বিরোধী মতবাদকে অবাস্তব ও স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত "সংস্কারবাদ" আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এই লেনিনীতত্ত্বের সঙ্গে এ-যুগের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বৈসাদৃশ্য বারবারই চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর কম্যুনিষ্টরা নিজেদের মতের সমর্থনে পর্যায়ক্রমে দু'টি পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার সাহায্য নিয়েছেন : কখনও বলেছেন যে, ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রবঞ্চক, কারণ আপোষের-পথে যে-আজাদী পাওয়া গেছে তা যথার্থ হতে পারে না ; আবার কখনও বলেছেন যে, আমরা যা-পেয়েছি সেটা স্বাধীনতাই বটে, তবে আপোষের পথে এটা পাওয়া গেছে এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা ভ্রান্ত অথবা মিথ্যাবাদী।

অথচ স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ক্ষমতা যথার্থ হস্তান্তরই হয়েছে, এবং অনেকটা অপ্রত্যাশিত শান্তিপূর্ণ উপায়েই এটা হয়েছে। বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি পাশ্চাত্যদেশের বর্তমানকালীন, আভ্যন্তরীন ইতিহাস এ-দিক থেকে আরও শিক্ষাপ্রদ। এ-সব দেশে রাষ্ট্রের উপর ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—অথচ গণতান্ত্রিক পথেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান যেমন সত্য, বৃটেন-সুইডেন-আমেরিকায় শ্রমিক সংগঠনের প্রভাবে রাষ্ট্রীয় নীতির ও সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তনও তেমনই সত্য; অভিজ্ঞতা হিসাবে কোনটিরই মূল্য কম নয়। এ-কথা ঠিক যে, লাঞ্ছিত মানুষের মানবিক অধিকার অর্জন কখনই শাসকগোষ্ঠীর কৃপার দ্বারা সম্ভব নয়; সেজন্য সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন সন্দেহাতীত—ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্যদেশেও। কিন্তু এই সাংগঠনিক শক্তি প্রবল হলে এবং রাষ্ট্রের চরিত্রগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলেই শাসকশ্রেণী গণতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে নগ্ন দমননীতির পথ গ্রহণ করবে, এ-সিদ্ধান্ত সূত্র হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না—সম্ভাবনার অন্যতম প্রান্ত হিসাবেই শুধু স্বীকার করা চলে। এ-বিষয়ে লেনিনীমত গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাকে মূলে অস্বীকার করে পরিণামে বিপন্ন করেছে এবং ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে স্বৈরতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবিতার ভ্রমাত্মক কল্পনা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে স্বৈরাচারের শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করেছে।

লেনিনের দেশে ও তৎকালে তাঁর মত প্রযোজ্য ছিল কিনা, সেটা আজ প্রশ্ন নয়। লেনিনী মতবাদ আজকের যুগে প্রযোজ্য কিনা, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে লেনিনবাদকে গ্রহণ করা চলে কিনা, সেটাই বিচার্য। লেনিনের মতবাদ তৎকালীন পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত; এবং পরি-স্থিতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নানা মতবাদের মত লেনিনী মতবাদ আজ অগ্রাহ্য। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নূতন

সম্ভাবনার আবির্ভাবের পরও যাঁরা স্বৈরতন্ত্রী জারীয়-যুগের প্রভাবাক্রান্ত লেনিনী মতবাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অটল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের হয় নি এখনও —এ-কথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ছয়

মানুষের মুক্তির আদর্শ নিয়ে যে-আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ স্বৈরাচারে সে-আন্দোলনের ক্রমপরিণতিলাভ আদর্শগতভাবে আন্দোলনের শোচনীয় পরাজয়েরই জ্ঞাপনা। তবু এ-আশা হয়তো অলীক কল্পনা নয় যে, কোন এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতে এই সোভিয়েত দেশে গণতন্ত্রের একটি নূতন রূপ বিবর্তিত হবে। কোন সমাজব্যবস্থাই অক্ষয় নয়; বর্তমান সোভিয়েত সমাজব্যবস্থাও চিরস্থায়ী হবে না। সে-দেশেও মানুষের ধ্যানধারণা অচিন্তিত পথে রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধের উদ্যত তর্জনীকে অমান্য করে অগ্রসর হবে; কালের স্রোত তট পরিবর্তন করে নূতন জনপদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হবে।

সেই নূতন যুগের কোন অস্পষ্ট আভাসও কি আজ এ-তট থেকে পাওয়া যাবে? বহু সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের একটি সম্ভাবনাই শুধু এখানে নির্দেশ করব। মার্ক্সীয় চিন্তায় রাষ্ট্রবিহীন সমাজের একটি ইঙ্গিতময় কল্পনা আছে। মার্ক্সের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ যেদিন যুগচিহ্নিত বলে পরিত্যক্ত হবে, তাঁর আদর্শ হয়তো সেদিনও সোভিয়েত সমাজের বিবর্তনকে প্রভাবান্বিত করবে। নৈরাষ্ট্রবাদী কল্পনার বাস্তবে রূপায়ণ অনিশ্চিত হ'লেও তার পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে শাসকদলের বিলোপ এবং শাসনব্যবস্থায় সমাজের কর্তৃত্বস্থাপনের দাবি

একদিন সোভিয়েত দেশে গণদাবিতে পরিণত হতে পারে। কম্যুনিষ্টদলের ক্রমবিলোপের পথে দলোত্তর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হয়তো সোভিয়েত রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী উচ্চতর ধাপ। দলীয় শাসনমুক্ত সেই সোভিয়েত সমাজে সাংস্কৃতিক সংগঠনের স্বাধীনতা অবাধ হবে; মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ রাষ্ট্ররক্ষিত গোঁড়ামির মর্যাদাচ্যুত হবে; এবং গণপরিষদে রোজা লুক্সেমবুর্গ-কল্পিত অবাধ মতবিরোধের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারিত হবে। এটা অবশ্য সম্ভাব্য ভবিষ্যতের একটি আদর্শীকৃত চিত্রমাত্র। এই বাঞ্ছিত পরিণামের পথে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব আজকের সোভিয়েত একতান্ত্রিক শাসনের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত বৈরভাবমুক্ত শুভেচ্ছা-প্রণোদিত শান্তিপূর্ণ অথচ অনমনীয় বিরোধিতার ভিতর দিয়েই।

১৯৫৬

গণতন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি

॥ এক ॥

যে-শাশ্বত ধর্মে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল সেই নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস এ-যুগে দুর্লভ। এই বিশ্বাসভঙ্গের পটভূমিকার প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি আকর্ষণ করা বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পক্ষে প্রয়োজন।

মধ্যযুগীয় ধর্ম শুধু কয়েকটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সীমায়িত ছিল না; সামাজিক আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তার অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠীর রীতিনীতিতে পার্থক্য যদিও প্রাচীনকাল থেকেই সুস্পষ্ট, এবং ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে ও পর্যটকদের বিবরণে এই পার্থক্যের প্রতি যদিও তৎকালীন মানুষের দৃষ্টিও আকর্ষিত হয়েছে, তবু কোনো বিশেষ সমাজের রীতিনীতিতে যতদিন পরিবর্তন প্রকট হয়ে ওঠে নি ততদিন সেই সমাজের মানুষের পক্ষে নিজস্ব আচার-বিচারের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন হয় নি। বরং বিশেষ ব্যক্তি বা বংশের আয়ুস্বল্পতার তুলনায় প্রাচীন বিধি-নিষেধের স্মরণাতীত যুগে উত্তপত্তি ও অব্যাহত প্রতিষ্ঠায় সেদিন এমনই একটা অবিনশ্বরতার অঙ্গীকার ছিল যে, শাস্ত্রীয় সত্যের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ—আকাশের গায়ে থুতু দেবার মতই হাস্যকর প্রয়াস মনে হয়েছে।

একই সমাজের বিভিন্ন স্তরে রীতিনীতির পার্থক্য প্রাচীন যুগেও চোখে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভিতর সম্পর্ক সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে নির্ণীত ছিল; আর একই মানুষের পক্ষে

এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া সহজ ছিল না। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তিবিশেষের স্থান অথবা অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ সামান্যই ছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক পরিবেশে যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভিতর যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিশেষতঃ মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল আজ সে-ব্যবধান ভেঙ্গে যাচ্ছে। একই লোকের পক্ষে সমাজের এক স্তরে জীবন শুরু করে ভিন্ন স্তরে অতিক্রান্ত হওয়া আধুনিক সমাজে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থায় একই লোক জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন আচারে অভ্যস্ত ও বিভিন্ন বিচারে বিশ্বাসী হবার প্রয়োজনের সম্মুখীন। সামাজিক ভাঙা-গড়ার যুগে আচার-বিচারের সনাতনত্বের চেয়ে তার আপেক্ষিকতাই যদি ব্যক্তির চেতনায় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আধুনিক বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য এ-দিক থেকে লক্ষণীয়। পণ্ডিত মহলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নানা তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও এ-কথা বলা চলে যে, মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবিশ্রেণী ঐতিহ্যের বাহক ছিলেন। শাস্ত্রের শ্রদ্ধান্বিত ব্যাখ্যা, প্রচলিত সমাজনীতির স্বপক্ষে যুক্তিতর্কের অবতারণা, এবং পাণ্ডিত্যের সহায়তায় সাধারণ মানুষের মনে এই নীতিগুলি সম্বন্ধে একটা ভীতিমিশ্রিত ভক্তির ভাব সৃষ্টি করা মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীর প্রধান কর্তব্য ছিল। মধ্যযুগীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই সমাজের একই স্তরের বাসিন্দা ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ এদেশের ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-যুগের বুদ্ধিজীবীরা কিন্তু সমাজের নানা স্তর থেকে এসেছেন। এঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহ্যগত পটভূমিকা এক নয়। এ-বিষয়ে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকদের এবং বিশেষত সুপণ্ডিত মানহাইমের চিন্তা-ধারা অনুধাবনযোগ্য। বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিকোণের দ্বন্দ্ব আধুনিক

বুদ্ধিজীবী মহলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগে জ্ঞানার্জনের রাজপথ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, শ্রদ্ধা; আর আধুনিক যুগে, সন্দেহ।

এ-যুগের সন্দেহ প্রবণতা শুধু আচার বিচারের বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়। সত্য, ন্যায় ইত্যাদি মৌল আদর্শ সম্বন্ধেও এ-যুগের মনে অবিশ্বাস প্রবল। অর্থাৎ, নৈর্ব্যক্তিক সত্য এবং নিরপেক্ষ ন্যায়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিহান। নিশ্চিত জ্ঞানের সম্ভাবনাকে সন্দেহ করেই আধুনিক দর্শনের একটি প্রধান ধারা শুরু হয়েছে। আরও লক্ষণীয় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ ঝোঁক। এ-যুগের মনস্তাত্ত্বিক বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তির বিশ্বাস ও ব্যবহার অনিবার্যভাবে তার অবদমিত বাসনার দ্বারা নানা জটিলপথে নিয়ন্ত্রিত। ব্যক্তির চিন্তায় অবচেতন কামনার প্রভাব এমনই ওতপ্রোত যে তাতে কোনো নিরপেক্ষ সত্যের প্রতিফলন আশা করা বাতুলতা। নিরপেক্ষ ন্যায় সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ফ্যাশি-বাদী বিশ্বাস করেন যে, মানুষের ইতিহাসে প্রধান ঘটনা. জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যখন প্রত্যক্ষ নয়, আপাতদৃষ্টিতে যখন আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষিত, তখনও ভিতরে ভিতরে যুদ্ধেরই আয়োজন চলে; আর যুদ্ধই যদি ইতিহাসের মূল উপাদান হয় তো ন্যায়ের কোনো নিরপেক্ষ আদর্শের কথা বলা হাস্যকর। জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোনো উপায়ই অন্যায় নয়। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতেও মানুষের ইতিহাস সংগ্রামেরই ইতিহাস, শ্রেণী-সংগ্রামের। প্রতিটি শ্রেণী সেই নীতির দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে, যাতে তার স্বার্থ রক্ষিত হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ন্যায়ের কোনো শাশ্বত আদর্শের কথা বলা ভাবালুতা। সত্য সম্বন্ধে মার্ক্সীয় দর্শনে একটা দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। কর্মক্ষেত্রে যে-মতটির প্রভাব বেশী তা এই যে, প্রতিটি

শ্রেণী সত্য হিসাবে তাই গ্রহণ করে থাকে যাতে তার স্বার্থ সিদ্ধ হয় ; এবং এই দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে কোনো নিঃশ্রেণীয় সত্যের কল্পনা, বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ছলনা মাত্র।

॥ দুই ॥

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, সত্যের যে-রূপ ব্যক্তিবিশেষের কাছে প্রত্যক্ষ তা সেই ব্যক্তির মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে থাকে। আর যদিও একই শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্যা বিভিন্ন তবু এ-কথা স্বীকার্য যে, ব্যক্তির বৈষয়িক স্বার্থ বহুপরিমাণে শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্ভুক্ত এবং ব্যক্তির দৃষ্টিকোণে শ্রেণীয় দৃষ্টিকোণের প্রভাব প্রায়শ লক্ষণীয়।

কিন্তু "শ্রেণী সত্য" বলে কোনো সত্য নেই। এ-বিষয়ে সিডনি হুকের মন্তব্য স্মরণীয়। শ্রেণী সত্য বলে কোনো বস্তু নেই ; শ্রেণীগত স্বার্থে সত্যের বিকৃতি বা অপলাপ আছে মাত্র। যেমন সত্যের শ্রেণীগত বিকৃতি আছে, ন্যায়েরও তেমনই। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের এই শ্রেণীগত বিকৃতি স্বীকার করতে হলেও শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়ের একটি আদর্শগত প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা প্রয়োজন। ফ্যাশিবাদ অথবা উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ যেমন শ্রেণীস্বার্থে তেমনই জাতীয় স্বার্থেও সত্য ও ন্যায়ের অপলাপ সম্ভব, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের আদর্শগত প্রতিষ্ঠা জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে। হিটলারের অস্ট্রীয়া দখলে জাতীয় ন্যায়ের কোনো নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; ন্যায়ের আদর্শ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা অপমানিত হয়েছে মাত্র। স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচারিতায় ন্যায়ের অপলাপ ঘটে মাত্র, ব্যক্তিগত

ন্যায়ের কোনো নূতন উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ হিসাবে প্রতি মানুষের আত্মোন্নতির সমানাধিকারের যে-নীতি যুগ-যুগ ধরে দুর্বলের দুর্বলতা ও ক্ষমতাবানের ক্ষমতা দ্বারা খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বযুগের আদর্শবাদীদের চিন্তায় বার বার ফিরে এসেছে, সেই সর্ব-মানবিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের পরিমাপেই কোনো বিশেষ স্থান-কাল নিবদ্ধ বা রাজশক্তি নির্ধারিত বিধির নৈতিক মূল্যায়ণ সম্ভব।*

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সংস্কার অথবা স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা আছে, এ-বিশ্বাস যে-সমাজে চূর্ণ হয়ে যায় সে সমাজ ক্রমশ চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথবা রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারের দিকে এগিয়ে' যায়। যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনো সত্য না থাকে প্রতিটি ব্যক্তিই তবে অভিজ্ঞতার এমন একটি দ্বীপ যার সঙ্গে অন্য কোন দ্বীপের কোনো সেতুবন্ধন নেই। এমনই একটা ধারণার বশে আধুনিক শিল্পসাহিত্যের কোনো কোনো মহলে একটা অহংকেন্দ্রিক দুর্বোধ্যতার দিকে দুর্নিবার ঝোঁক লক্ষণীয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এই ঝোঁক যে-যে সমাজে বেশীদূর ব্যাপ্ত হয়েছে সাধারণত সেই সেই সমাজে আবার এক ধরণের "বোহেমীয়" বিশৃঙ্খলার দিকেও ঝোঁক দেখা গেছে।

সমস্যা অবশ্য এখানেও শেষ হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক স্থাপন শুধু ব্যবহারিক স্বার্থের খাতিরে নয়, মনের স্বাস্থ্য ও সমগ্রতার জন্যই একান্ত প্রয়োজন। সমাজে পারস্পরিক সাহিত্যের

---

* একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সত্যেরও প্রকারভেদ আছে। কিন্তু তা সত্যেরই প্রকার ভেদ ; অর্থাৎ, প্রকারের বিভিন্নতার আরোপস্থল হিসাবে একটি পরা সত্তার ধারণা স্বীকার্য। এবিষয়ে মতবিরোধের অবকাশ থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই বাদ-বিসংবাদের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। অর্থাৎ, শ্রেণীগত বা জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে যে-দ্বন্দ্ব তার মূলে আছে সত্যের নয়, অসত্যের প্রকারভেদ। সত্য নিঃশ্রেণীয় ; সত্য মানবিক।

ভিত্তি যখন চূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন আদিম বন্য সংহতির ভিতর আশ্রয়হীন মানুষের মনকে আহ্বান করা সহজ হয়। এমনই একটা হিংস্র সংহতির অভিব্যক্তি হিসাবেই জার্মানীতে নাৎসীবাদের আবির্ভাব। আধুনিক একনায়কতন্ত্র শুধু শাসন ব্যবস্থার একটা বিশেষ রূপ নয়। ব্যক্তি ও সমাজের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণার উপর আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন করেছিলেন, কারণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে ন্যায়ের প্রতি আনুগত্যকেই তিনি উচ্চতর কর্তব্য বলে বিশ্বাস করতেন। রাষ্ট্রের বিশেষ বিধিকে অতিক্রম করেও সত্য, ন্যায় ইত্যাদির একটা স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠা আছে বলেই অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রকে অমান্য করবার নৈতিক অধিকারও আমাদের আছে। আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রে সত্য ও ন্যায়ের এই আদ্য প্রতিষ্ঠা অস্বীকৃত। অবশ্য আইন অমান্য করবার অধিকার আত্মরক্ষার খাতিরে কি সার্বিক, কি গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রই স্বীকার করে নিতে পারে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিবেকভিত্তিক আপত্তি বা অসহযোগ ("conscientious objection") গ্রাহ্য করবার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ অপরাধীদের তুলনায় একটা বিশেষ মর্যাদা দেবার দিকে যে ঝোঁক আছে, আধুনিক সার্বিক রাষ্ট্রে তার বিপরীত ঝোঁকই প্রকট। রাজনৈতিক বন্দীরাই সার্বিক রাষ্ট্রে ধিক্কৃততম অপরাধী এবং বিরোধীদের সকল নৈতিক মর্যাদা কেড়ে নিয়ে তাঁদের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করবার সযত্ন চক্রান্ত আধুনিক সার্বিক আন্দোলনের নীতিবিশেষ। বলা বাহুল্য যে, বহু তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আজ সার্বিক আন্দোলনের এই ঘৃণ্য নীতির প্রভাবে আক্রান্ত।

এ-প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, সার্বিক রাষ্ট্রের অধিনেতারা

নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী "সত্য" উদ্ভাবন করতে দ্বিধা করেন না। নাৎসী জার্মানীর অন্যতম অধিনেতা হিমলারের একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা অসঙ্গত হবে না। হিমলার বলেছিলেন :

"We don't care a hoot whether this or something else was the real truth...science proceeds from hypothesis that change every year or two. So there is no earthly reason why the party should not lay down a particular hypothesis as the starting point, even if it runs counter to current scientific opinion. The one and the only thing that matters is to have ideas of history that strengthen the people in their necessary national pride."

হিমলার এখানে সত্যের বাস্তবতা সম্বন্ধে আধুনিক অবিশ্বাসকেই সত্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতির স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিকরাও যখন সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে পারেন না, তাঁদের পূর্বকল্পিত ধারণার যখন কিছুদিন পর পরই পরিবর্তন ঘটে, তখন বিজ্ঞানবিরোধী একটা তত্ত্বকে, অর্থাৎ মিথ্যা বলে প্রমাণিত একটা তত্ত্বকেও, জাতীয় স্বার্থে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে ক্ষতি কি! কম্যুনিষ্ট শাসিত সোভিয়েত দেশেও একই দুর্লক্ষণ বারবার দেখা গেছে। ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে ইতিবৃত্তকে মিথ্যা ভাষণে পরিণত করতে কম্যুনিষ্ট নেতারা ইতস্তত করেন নি।

পোলানীর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করা যেতে পারে।

"The totalitarian form of the State arises logically from the denial of reality of this realm of transcen-

dent ideas. When the spiritual foundation of all freely dedicated human activities—of the cultivation of science and scholarship, of the vindication of justice, of the profession of religion, of the pursuit of free art and free political discussion—when the transcendent grounds of all these free activities are summarily denied, then the State becomes, of necessity, inheritor to all ultimate devotion of men. For if truth is not real and absolute, then it may seem proper that the public authorities should decide what should be called the truth". (Michael Polanyi. The Logic of Liberty).—অর্থাৎ যদি রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে এমন কোনো আদর্শ না থাকে যে আদর্শের সেবায় জীবন উৎসর্গ করা যায়, তা হলে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের শরণার্থী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আর সত্যের যদি কোনো তৎপ্রতিষ্ঠা না থাকে, তা হলে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "সত্য" নির্দ্ধারিত করা অযৌক্তিক বিবেচিত নাও হতে পারে।

॥ তিন ॥

সত্যের সাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস এক জিনিষ; আর সেই সত্য কোনো শাস্ত্রবিশেষে সীমিত, অথবা কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থায় সিংহাসনারূঢ়, এ-সিদ্ধান্ত ভিন্ন জিনিষ। এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিই

মধ্যযুগীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই মধ্যযুগীয় বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া আজ না-প্রয়োজনীয়, না-বাঞ্ছনীয়।

এ-কথা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই, বরং স্বীকার করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয় যে, সত্যের প্রকাশ বিচিত্র, এবং তার আংশিক উপলব্ধিও মিথ্যার প্রলেপে আচ্ছন্ন হবার নিয়ত সম্ভাবনা। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ও সমাজবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এ-দিক থেকেই আমাদের আত্মজ্ঞান ও সত্যজ্ঞান বাড়াবার পথে সহায়ক। যে কোনো ব্যক্তির সত্যোপলব্ধিতে সত্যানৃতের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী বলেই স্বাধীন মত প্রকাশ ও আলোচনার গণতান্ত্রিক অধিকার সত্যের পথে সহায়ক। অর্থাৎ, যে-হেতু কোনো সাময়িক সিদ্ধান্তেই সমগ্র সত্য বিধৃত হতে পারে না, অতএব বিভিন্ন, এমন কি পরস্পরবিরোধী, নানা সিদ্ধান্তের সহসত্তা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পূর্ণতর সত্যের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টাই সমাজে প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছনীয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজেও যেমন, সমাজতান্ত্রিক সমাজেও তেমনই মিথ্যাকে রোধ করবার নামে স্বাধীন আলোচনার পথ রুদ্ধ করলে তাতে সত্যকেই রোধ করা হবে। অনুন্নত উপজাতীয় (tribal) সমাজব্যবস্থায় একটা স্বতস্ফূর্ত সামাজিক ঐক্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। এই উপজাতীয় একতাবোধের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানে আবারও আমরা দ্বন্দ্বমুক্ত সেই সহজ ঐক্যভাবে বা তার কোনো বিকল্পরূপে ফিরে যেতে পারব। কিন্তু সামাজিক ও মানসিক দীর্ঘ বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ কর্মে ও চিন্তায়, সাধ্যে ও অনুশীলনে এতো বিভক্তিকৃত যে, উপজাতীয় ঐক্যের আদর্শে প্রত্যাবর্তন আজ অসম্ভব। আধুনিক সমাজে তাই শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি এবং জীবনচর্যার অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী

প্রকাশ স্বাভাবিক। বিভিন্ন বৃত্তি, পরিস্থিতি অথবা চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরে যাঁদের অবস্থান তাঁদের ভিতর মত ও নীতির মৌলিক দ্বন্দ্ব আজকের জটিল সমাজে অস্বাস্থ্যের নয়, বরং স্বাভাবিক স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। ভয়ে, সাময়িক উত্তেজনায়, অথবা আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাবে যখন মানুষ চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই শুধু এই দ্বন্দ্বের সাময়িক নিবর্তন সম্ভব। যদি গণতান্ত্রিক অধিকার বাহ্যত স্বীকৃত থাকা সত্ত্বেও কোনো সমাজে আজ নীতির ক্ষেত্রে মতৈক্য ও বিচারের ক্ষেত্রে মৌলিক দ্বন্দ্ব উচ্চারিত না হয়, তা হলে সে সমাজ—অসুস্থ সমাজ; আর যে রাষ্ট্র মতের মৌলিক দ্বন্দ্ব উচ্চারণ করবার অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সে-রাষ্ট্র সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেই বিপন্ন করেছে।

দ্বন্দ্বের অধিকার মৌলিক; কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজে বিশ্বাসেরও স্থান আছে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক ভিত্তি হিসাবে ঐক্য বাঞ্ছনীয় এই একটি বিশ্বাসে যে, সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং বিভিন্নমুখী অন্বেষণের লক্ষ্য হিসাবে এমন একটি সত্য বস্তু আছে যা অনন্তরূপী হয়েও স্বপ্রতিষ্ঠিত। কারণ, এ বিশ্বাস যদি না থাকে তা হলে সমস্ত বাদ-প্রতিবাদই শুধু নিরর্থক কোলাহল; এবং এমন একটা নিরর্থক ব্যাপার যদি কোনো রাষ্ট্র সাময়িক স্বার্থের প্ররোচনায় অত্যন্ত উপেক্ষার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করতে উদ্যত হয় তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

বস্তুত আধুনিক একদলীয় বা অধিনায়কতান্ত্রিক সমাজে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শের প্রতি দু'টি বিপরীত ধারণার যুগ্ম প্রতিষ্ঠা দেখা যায়। সাধারণ কর্মীকে এই প্রাচীন উপজাতীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করা হয় যে, গোষ্ঠীর নেতা অথবা নেতৃস্থানীয় শাসকমণ্ডলী অভ্রান্ত, সত্যদ্রষ্টাস্বরূপ; আর নেতৃস্থানীয়েরা বিশ্বাস করেন যে সত্য বলে কোনো বস্তু নেই, রাষ্ট্রের স্বার্থ অনুযায়ী সত্য-মিথ্যার নির্ধারণই সঙ্গত রাজনীতি। গণ-তান্ত্রিকের কর্তব্য এই দুই ভ্রান্তির অবিরাম বিরোধিতা। সত্যের

ভিত্তি সাময়িক স্বার্থে নয় ; আবার সত্য কোনো নেতৃবিশেষে মূর্তিমান বা শাস্ত্রবিশেষে সীমায়িতও নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাজাত্য-বোধের যে-প্রেরণা মানুষের প্রকৃতিগত, সেই এষণা আজ পরিতৃপ্ত হতে পারে শুধু এমন কোনো সাম্যবাদী সমাজে যেখানে মানুষের ঐক্যের প্রতিষ্ঠাভূমি কোনো প্রত্যক্ষ শাস্ত্রে অথবা সর্বস্বীকৃত নেতৃত্বে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সমান অধিকারের স্বীকৃতিতে এবং এই মৌল উপলব্ধিতে যে, যে-সত্যকে বহু মানুষ বহুভাবে অন্বেষণ করছে সেই সত্যই মানুষকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী শ্রেণী অথবা জাতি হিসাবে বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করে একটি বৃহৎ সামান্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

সমবায়ের পথ

এদেশে অবশেষে শিল্পবিপ্লব মনে হয় সত্যি শুরু হল। এগিয়ে-যাওয়া অন্যান্য দেশগুলির শিল্প-বিপ্লবের আদিপর্বের দিকে এ-সময়টায় আমাদের চোখ পড়াই স্বাভাবিক। আর তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবার চেষ্টাও সমান স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো দু'টো দেশের অভিজ্ঞতাই অভিন্ন হয় না। তা ছাড়া আমাদের দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। উনিশ শতকে যে-সব দেশে শিল্প-বিস্তার সাধিত হয়েছে সে-সব দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক রূপ ধারণ করেছে শিল্পোন্নয়নের অনেকটা প্রাগ্রসর পর্য্যায়ে। যেমন ইংলণ্ডে গণভোট যখন প্রতিষ্ঠিত হল ততদিনে শিল্পোন্নয়নের বনিয়াদ সে-দেশে বেশ পাকা হয়ে গেছে। এ-দেশে অবস্থাটা ভিন্ন। আমাদের শিল্পবিপ্লবের গোড়াতেই আমরা শুরু করছি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাগ্রসর ফলস্বরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ে। কাজেই উনিশ শতকের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের পথ নির্ণয় করা চলে না।

এই পার্থক্যের কথা স্মরণ রেখে শিল্পোন্নয়নের কয়েকটি মূল সমস্যার প্রতি এবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। সমস্যাগুলি অবশ্য বহুবিধ। কিন্তু আমাদের মূল বক্তব্য পরিস্ফুট করবার জন্য এই বহু-র ভিতর একটি সমস্যার এবং তারও একটিমাত্র দিকের আলোচনাই যথেষ্ট হবে। এই বিশেষ সমস্যাটি হল সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধি সংক্রান্ত। আর্থিক উন্নতির জন্য দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন; অর্থাৎ, সামাজিক পুঁজিবৃদ্ধির দিকে অর্থ বিনিয়োগ করা আবশ্যক। শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে দেখা যায় যে জাতীয়

আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগের মত পুঁজিবৃদ্ধির কাজে লাগানো হচ্ছে ; অন্যদিকে উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের বারো, পনের এমন কি বিশভাগ যাচ্ছে নীট পুঁজি সৃষ্টিতে। তা হলে বলা যায় যে, পুঁজি সৃষ্টির হারটা আয়ের শতকরা পাঁচ ভাগ থেকে কি করে পনের ভাগে তোলা যায়—এটাই হল আর্থিক উন্নতির প্রথম পর্য্যায়ের একটি মূল সমস্যা। একবার শতকরা পনের ভাগে তুলতে পারলে তারপর সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে আসে। তার আগে পর্য্যন্ত আয়ের একটা ক্রমবর্দ্ধমান অংশ জীবিকা থেকে সরিয়ে রাখতে হয় পুঁজিবৃদ্ধির খাতিরে, অর্থাৎ, আয় যতটা বাড়ে জীবিকার মান ততটা বাড়ানো চলে না। অথচ একই সময়ে শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা নূতন সামগ্রীর সঙ্গে লোকের পরিচয় ঘটে। আর ভোগের বাসনা বেড়েই চলে। সমস্যাটা কঠিন বটে : একদিকে আর্থিক উন্নতির জন্য জীবিকার আশু উন্নয়ন ঠেকিয়ে রেখে সঞ্চয় এবং পুঁজি বিনিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন, অন্যদিকে শিল্প-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বাড়বার দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। এই দুই বিপরীত ঝোঁকের ভিতর সাম্য প্রতিষ্ঠা কঠিন। আর যে-দেশে গণতন্ত্রের বালাই নেই, বা গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল, সে-দেশে এই সমস্যার যে-সমাধান ভাবা যায় গণতান্ত্রিক দেশে সে-সমাধান ভাবা যায় না।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের শুরু আঠার শতকের শেষভাগে। ১৭৯৯ সাল থেকে ১৮২৪ সাল অবধি শ্রমিক সমিতিগুলি ছিল বে-আইনী। আইন-সঙ্গত হওয়ার পরও শ্রমিক আন্দোলন দুর্ব্বল ছিল উনিশ শতকের বহুদূর পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ, শ্রমিক আন্দোলন যতদিনে শক্তিশালী হয়েছে ততদিনে ইংলণ্ডে শিল্প সমৃদ্ধির বনিয়াদ তৈরী হয়ে গেছে। জাপানে শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, আর দ্রুত শিল্প-প্রসার শুরু হয়ে গেছে উনিশ শতকের শেষভাগে। সোভিয়েত

যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট দল ক্ষমতায় আসবার পর শ্রমিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সরকারী কুক্ষিগত করেছে। অর্থাৎ, এ-সব দেশেই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রথমভাগে শ্রমিকদের অসন্তোষকে সংঘবদ্ধ রূপ দেবার উপায় বড় ছিল না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে কিন্তু একথা বলা চলে না। এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের শক্তি এখনও পূর্ণতা লাভ করে নি বটে; তবু শিল্পবিপ্লবের তুলনীয় পর্য্যায়ে অন্যান্য প্রাগ্রসর দেশে শ্রমিক সংঘবদ্ধতার যে অবস্থা ছিল, এদেশের আন্দোলন ইতিমধ্যেই তার চেয়ে শক্তিমান। আমাদের সমস্যার এই এক বৈশিষ্ট্য।

শ্রমিকদের ছেড়ে চাষীদের কথা ধরলেও আমাদের সমস্যার একই বৈশিষ্ট্য আবার চোখে পড়ে। সোভিয়েত দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রুত শিল্প-প্রসারের একেবারে গোড়ার দিকে যৌথ খামার স্থাপনের জবরদস্ত চেষ্টার ফলে পল্লী অঞ্চলে প্রায় গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যৌথ খামার একবার স্থাপিত হবার পর চাষীদের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব এমনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে স্বাধীন চাষী আন্দোলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, আর সরকারের পক্ষে চাষীদের আয়ের একটা মোটা অংশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য সরিয়ে রাখা সহজ হল। জাপানে অবস্থাটা অন্যরকম। ১৮৬৮ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে যাঁরা জাপানের আর্থিক উন্নয়নের নূতন যুগের সূচনা করলেন তাঁরা কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে শ্রমিক কৃষকের দাবী কণ্ঠে তুলে ক্ষমতায় আসেন নি। তাঁরা যখন জাপানের পুনর্গঠন শুরু করলেন তখন সামন্তপ্রথার অবসান ঘটল, কিন্তু সামন্তবাদী ঐতিহ্যের অনেকখানি থেকেই গেল। পুরানো যুগে চাষীরা খাজনা দিত সম্রাটের প্রতিভূকে; শিল্পোন্নয়নের নূতন যুগে খাজনা দিতে হল, তেমনই উঁচু হারে, সরকারকে। এদেশে অবস্থাটা ভিন্ন। সে-দিনকার জাপানের তুলনায়

আজকের ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রাবল্য বেশী। চাষীদের উপর বেশী করের বোঝা চাপাতে গেলে নির্বাচনে তাদের হাতে রাখাও কঠিন হবে শাসকদলের পক্ষে। অর্থাৎ, গোড়ার প্রশ্নেই আবার ফিরে আসতে হয়ঃ শিল্পোন্নয়নের এই প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা যারা গণতন্ত্রকে মত ও পথ হিসাবে গ্রহণ করেছি, আমাদের কি কর্ত্তব্য? সমাজের সংহতিকে বাঁচিয়ে, গণতন্ত্রকে বিসর্জ্জন না দিয়ে, শিল্পোন্নয়ন সম্ভব কোন পথে?

শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক পর্যায়ের ক্লেশ অবশ্য কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করা যায় বিদেশী মূলধনের সাহায্যে। অন্যদেশ থেকে যে দান আমরা গ্রহণ করব তাতে অন্যদেশেরও যে কোনো স্বার্থ-সিদ্ধ হবে না এমন নয়, কিন্তু পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতেই যেমন সমাজে বিভিন্ন মানুষের ভিতর সহযোগ ঘটে থাকে, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনই স্বার্থের পারস্পরিকতার ভিত্তিতে সহযোগিতা চলতে পারে। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করব, অথচ বিদেশী মূলধনের সহায়তা গ্রহণ করব না, এমন জেদ রাখলে পরিকল্পনার ব্যয় বহন করতে গিয়ে গণতন্ত্রকে বিসর্জ্জন দিতে হতে পারে।

তবে সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখাই ভালো যে, বিদেশী সহায়তায় শিল্পোন্নয়নের বোঝা সামান্য লাঘব হতে পারে মাত্র, বোঝা বইবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, প্রশ্ন থেকেই যায়ঃ গণতান্ত্রিক দেশে শিল্পোন্নয়নের কঠিন আরম্ভে অগ্রসর হতে হবে কোন পথে?

যে পথের কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য তার নামকরণ করা যায় 'সমবায়ের পথ'। সমবায় শব্দটা অবশ্য এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে একটি বিশেষ ব্যাপক অর্থে। সমবায়পন্থী সমাজে কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হবে সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংস্থার যুক্ত-

মন্ত্রণার ভিত্তিতে। উদাহরণে বলা যায় যে, শ্রমিক সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারের সহমন্ত্রণা ও সমবায়ের পথ প্রশস্ত করা প্রয়োজন। অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও একই কথা। এমন কি বিরোধী দলগুলির সঙ্গেও সরকারের সংযুক্ত নীতি পর্যালোচনার সুযোগ অবারিত করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য সরকার এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক দল ও সংস্থাগুলি সকল বিষয়ে একমত হবেন এমন কোনো আশা রাখা ভুল। কোনো কোনো বিষয়ে মতের বৈষম্য অনিবার্য্য এবং বিভিন্ন মতকে একাকার করবার চেষ্টাও গণতন্ত্রবিরোধী। কিন্তু শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক যুগে সামাজিক সংহতি রক্ষা করতে হলে যুক্ত আলোচনা ও সহযোগিতার ভিতর দিয়ে, বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে, যথাসম্ভব ব্যাপক মতৈক্য স্থাপনের চেষ্টা আবশ্যক।

সমবায়ী পথ সম্বন্ধে অনেকের মনে প্রশ্ন এবং অবিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয়। এই অবিশ্বাসের ভিত্তি অনুসন্ধান করবার আগে অন্য একটি কথা এখানে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া দরকার।

সমাজের আর্থিক জীবনের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক এবং পারমার্থিক জীবনের একটা যোগ যদিও আছে তবু এই যোগ জড়বাদীরা যতটা ঘনিষ্ঠ মনে করেন ততটা ঘনিষ্ঠও নয়। আর্থিক উৎপাদনের জন্য সাংগঠনিক সম্বন্ধ এবং নিয়মানুবর্তিতা আবশ্যক। কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে মোটামুটি মতৈক্য থাকলে গণতান্ত্রিক উপায়ে শিল্পোন্নয়ন সহজ হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে সংগঠন ও নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দেওয়া ভুল। আর্থিক জীবন থেকে যতই পারমার্থিক জীবনের দিকে সরে আসা যায় ততই সংগঠনের প্রাবল্য ছাড়িয়ে নির্জ্জন মানুষের ধ্যান-ধারণাই বড় হয়ে ওঠে। অনেক ধরণের গোঁড়ামির মত গোঁড়া জড়বাদী সমাজতন্ত্রের গোঁড়ামির একটা বিপদ আছে। সমাজের সাংস্কৃতিক ও

আত্মিক জীবন আর্থিক জীবন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ ধারণা যাদের বদ্ধমূল তাদের হাতে ক্ষমতা এলে তারা সাংস্কৃতিক-আত্মিক জীবনকেও সংগঠনদ্বারা বেঁধে মুড়ে দিতে চান আর্থিক জীবনেরই অনুরূপভাবে। এদেশের হিন্দু ঐতিহ্যে কিন্তু আচার-ব্যবহারকে শৃঙ্খলিত করেও ধ্যানধারণাকে মুক্ত রাখবার একটা ঝোঁক প্রাচীনকাল থেকে দেখা যায়। ব্যবহার ও চিন্তা উভয়কেই শৃঙ্খলিত করার চেয়ে এটা নিশ্চয়ই অনেক বাঞ্ছনীয়। সমবায়ের পথের কথা বলতে গিয়েও স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে জীবনে এমন ক্ষেত্রও আছে যেখানে মানুষের যা শ্রেষ্ঠ দান তা একক মানুষেরই ধ্যানের ফুল।

এবার আলোচনার পুরনো সূত্রে ফিরে গিয়ে নূতন করে প্রশ্ন তোলা যাক: শিল্পোন্নয়নের যুগে আর্থিক জীবনে যে ব্যবহারিক সংগঠন প্রয়োজন সমবায়ী প্রণালীতে কি তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব? মিতব্যয়িতা, নিয়মানুবর্তিতা, সময়নিষ্ঠা, শ্রমের মর্যাদাবোধ ইত্যাদি গুণে কি মানুষকে অভ্যস্ত করা যাবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেও? শিল্পোন্নয়নের জন্য এইসব গুণ অপরিহার্য্য। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে একদিন এইসব অভ্যাস সাধারণ মানুষের জীবনে গেঁথে দিতে সহায়ক হয়েছিল ধর্ম্ম, আইন, আর শিল্পপরিচালকদের দোর্দ্দণ্ডক্ষমতা। খানিকটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবশ্য নূতন অভ্যাস আয়ত্ত করবার প্রথম পর্য্যায়ে প্রয়োজন হয়েই থাকে। কিন্তু জোর-জুলুমের ভয় দেখিয়ে একটা নিয়ম মানিয়ে নেওয়া এক জিনিষ, আর নিয়মটা যে সত্যি প্রয়োজন এটা বুঝিয়ে তারপর নিয়ম-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা অন্য জিনিষ। চেষ্টাটা হবে মূলত কোন দিক থেকে, এটাই হল আসল প্রশ্ন। গণতান্ত্রিকের বক্তব্য এই যে, জোর দেওয়া উচিত শিক্ষার উপর। আর শিক্ষার উপরই যদি জোর দিতে হয় তা হলে বহু মানুষের কাছে পৌঁছবার জন্য প্রয়োজন

সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা প্রসারের কাজে টেনে আনা।

এর জন্য অবশ্য এই গণপ্রতিষ্ঠানগুলির একটা চরিত্রগত পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যেমন শ্রমিক সমিতিগুলির কথাই ধরা যাক। সোভিয়েত দেশে তিরিশের যুগে শিল্প প্রতিষ্ঠানে আমলাতন্ত্রের মুঠো যখন শক্ত হচ্ছে শ্রমিক সমিতিগুলি তখন তার বিরোধিতা না করে বরং আমলাতন্ত্রের হাতের কল হয়ে পড়ল, আর তাদের প্রধান কাজ হল শ্রমিকদের ভিতর নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা আর উৎপাদন বাড়ানোর কাজে সাহায্য করা। গণতান্ত্রিক দেশে এ জিনিষ আমরা চাইব না। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে শিল্পোন্নয়নের যুগের বিশেষ অবস্থার চাপেই সোভিয়েত শ্রমিক আন্দোলনের এই আমলাতান্ত্রিক স্বাধীনতা-ক্ষয় ঘটেছে। এ দেশেও অনুরূপ অবস্থার চাপ অবর্ত্তমান নয়। গণতন্ত্রের সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গতি ঘটাতে হলে এদেশের শ্রমিক সমিতিকে একই সঙ্গে দু'টি কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। একদিকে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা, কর্ত্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শ্রমিকদের জন্য মানুষের প্রাপ্য সম্মান আদায় করবার সংগ্রাম ; অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, শ্রম ও নিয়মানুবর্তিতার মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ শ্রমিককে সজ্ঞান করার প্রচেষ্টা—দু'দিকেই শ্রমিক সমিতিগুলির দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তা হলেই শুধু সমবায়ী সংকল্প এবং শ্রমিক সমিতিকে শিল্প পরিচালনার কাজে যুক্ত করবার পরিকল্পনা সফল হতে পারে।

সমবায়ের পথে শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে না যদি শিল্পোন্নয়নের জন্য যে-ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন তাতে সবাই না অংশ গ্রহণ করে। সমাজে অর্থের বণ্টনে কিছু অসাম্য অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থায় অনিবার্য্য ; কিন্তু যে পরিমাণ অসাম্য এদেশে দেখা যায় তার কোনো সমর্থনই সম্ভব নয়।

আমরা এমন একটা যুগে শিল্পোন্নয়নের পথ ধরেছি যখন সাম্যের দাবী একটা যুগদাবী। এ যুগে সমাজের একাংশে বিলাসব্যসন অব্যাহত রেখে অন্যাংশে সংযম অভ্যাসের আবেদন উচ্চারণ করা পণ্ডশ্রম। এদিক থেকে সম্প্রতি যে ব্যয়কর লোকসভায় গৃহীত হয়েছে তার একটা বিশেষ উপযোগিতা স্বীকার করতে হয়। আয়করের হার কমিয়ে ব্যয়করের হার আরও বাড়ানো উচিত, যাতে উচ্চবিত্তদের ব্যয়ের সংকোচন হয় আর অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিনিয়োগযোগ্য সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে। শাসন বিভাগের দুর্বলতায় ব্যয়করের উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হলেই এখন মঙ্গল। ব্যয়করের সাহায্যে উচ্চবিত্তদের ব্যয়সংকোচ যদি সম্ভব না হয়, তবে হয় তো একই উদ্দেশ্যে অন্য কোনো আরও মৌলিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনিবার্য্য হবে; তা নইলে সামাজিক সাম্যের আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার দরুণ গণতন্ত্র বিপদগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

যদি সামাজিক সমবায় কার্যকরী করবার অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, যদি কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতার সুযোগ অবারিত করা হয়, যদি সমবায়ী আদর্শের অনুকূল লোকশিক্ষার প্রচেষ্টা ব্যাপক হয়, যদি উচ্চবিত্তদের বিলাসব্যসন সংযত করা যায়, তা হলে দেশোন্নয়নের কাজে আপামর জনসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করতে সম্মত হবে, এ আশা হয়তো দুরাশা নয়।

এ কথা বলা হয়েছে যে একনায়কতন্ত্রের সাহায্যে আরও দ্রুত শিল্পোন্নয়ন সম্ভব। কথাটা অসত্য নাও হতে পারে। একনায়কতন্ত্রে হয় তো আজকের ভাত কেড়ে নিয়ে পুঁজিবৃদ্ধির খাতে আরও বেশী সম্পদ ঢেলে দেওয়া যায় আর তার ফলে শিল্পোন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থেই যদি শিল্পোন্নয়ন বাঞ্ছনীয় হয়

তো সাধারণ মানুষের মত অনুযায়ীই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত যে আজ থেকে দশ, বিশ বা পঁচিশ বছর পরের সম্ভাব্য সমৃদ্ধির মুখ চেয়ে আজকের মানুষ কতখানি ক্লেশ স্বীকার করবে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে সাধারণ মানুষ আজকে কতখানি ক্লেশ স্বীকার করতে রাজী আছে তা কি করে বোঝা যাবে? শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার নামে আজকের মানুষের উপর সরকার যে করের বোঝা চাপিয়েছেন তা দেশের মানুষ মেনে নিতে রাজী আছে কি না তা অবশ্য বোঝা যেতে পারে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সরকারের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা জ্ঞাপন থেকে শিল্পোন্নয়ন মানুষেরই জন্য; মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে পদদলিত করে শুধু শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুত করলেই কিছু শুভ সাধিত হয় না। গণতান্ত্রিকের কাছে তাই প্রশ্ন এটা নয় যে, সমাজকে শৃঙ্খলিত করে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায় কি না। বরং প্রশ্ন এই যে, গণতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখে আর্থিক উন্নতি কতদূর দ্রুত করে তোলা যায়। গণতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখে আর্থিক উন্নতি দ্রুত করে তুলবার পথ হিসাবেই সমবায়ের পথের কথা এখানে বলা হয়েছে।

কেউ কেউ আবার বলছেন যে 'উদারপন্থী' ধনতন্ত্রের পথেই শিল্পোন্নয়ন দ্রুত হবে। কিন্তু এঁদেরও একটা কথা ভেবে দেখতে বলি। শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভিক যুগে করের বোঝা বাড়াটা অবশ্যম্ভাবী আর দ্রব্যমূল্য বাড়বার দিকেও এ-সময়ে একটা ঝোঁক থাকবে। এ-সময়ে সংঘবদ্ধ শ্রমিকরা যদি মজুরী বাড়াবার জন্য অবিরাম চাপ দিতে থাকে, আর বিরোধী দলগুলি সর্ব্বতোমুখী অসহযোগ শুরু করে, তা হলে আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। শুধু এ দেশে নয়, পশ্চিমী দেশগুলির গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন, পুঁজিবৃদ্ধি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যুগে সরকার, বিরোধীদল এবং

শ্রমিক সংগঠনের ভিতর কিছু পরিমাণ সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা করা সামাজিক স্থিতিস্থাপকতার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। আর এই কিছুপরিমাণ সহযোগিতা লাভ করতে গিয়েও ঝুঁকতে হয় আজকের গণতন্ত্রের যুগে অনেকটা সমবায়ী সমাজ সংগঠনের দিকেই।

একথা নিশ্চয়ই এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে সমবায়ী সমাজ ব্যবস্থা বলতে আমরা যে-জিনিষটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা গতানুগতিক সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে মোটেই সমার্থক নয়, বরং তা থেকে অনেকটা ব্যাপক। আমাদের ভাবনার বস্তু এখানে একটা মূল সমাজ-দর্শন আর সেই সঙ্গে এ-যুগের একটা বিরাট সমস্যার সমাধানে এই সমাজ দর্শনের প্রয়োগ। এই সমাজ-দর্শনের মূল সিদ্ধান্তটি সরল: স্বাধীন মানুষের সহযোগিতাই হল স্বাধীন সমাজের ভিত্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গী সরল হলেও এর সমালোচকের অবশ্য অভাব নেই। একটি বহুবিদিত বিরুদ্ধ যুক্তির অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করা যাক।

বলা হয়েছে যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, কাজেই আজকের দিনে সমগ্র সমাজের সহযোগিতার কোনো ভিত্তি নেই। বস্তুত শ্রেণীতে শ্রেণীতে কেন, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও স্বার্থের বিরোধ আছে; এক ব্যক্তির ক্ষতির মূল্যে অন্য ব্যক্তির লাভ প্রায়শ সম্ভব। তবু সামাজিক জীবনের ভিত্তিতে দেখি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহযোগিতা। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধের ভিত্তি অবশ্য আরও গভীর, যেহেতু সামাজিক সংগঠনে তার মূল নিহিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভিতর সহযোগিতার এমন সর্ত্ত খুঁজে পাওয়া যায় যাতে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ আংশিক ভাবে সিদ্ধ হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগের অধিকার অবশ্য স্বাধীন মানুষ মাত্রেরই আছে। এই অসহযোগেরও উদ্দেশ্য পূর্ণতর, উচ্চতর সহযোগের ভিত্তি-স্থাপনা। কালের পরিবর্ত্তনে ন্যায়ের আদর্শের পূর্ণতর ব্যবহারিক

সিদ্ধির সম্ভাবনা স্পষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সহযোগিতার প্রাচীন সর্ত্তগুলির শান্তিপূর্ণ সংশোধন সাধন করবার মত নমনীয়তা যে-সমাজে আছে সে-সমাজেই প্রগতির সম্ভাবনাও বেশী। এই দৃষ্টি-ভঙ্গীকে সংস্কারপন্থী বলা যেতে পারে। কিন্তু হিংসাত্মক বিপ্লবের পথে সামগ্রিক ভাঙ্গনের ভিতর থেকে যে নূতন সমাজ বেরিয়ে আসে তাতে ন্যায় বা স্বাধীনতার আদর্শ এক পরম সিদ্ধি লাভ করে এই কল্পনা এ-শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় সমর্থন লাভ করে নি। বরং যে আন্দোলন গণশক্তিকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ ক'রে দেশের পুনর্গঠনে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানায় এবং এই স্বেচ্ছাস্বীকৃত দায়িত্বের ভিত্তিতে নূতন অধিকার অর্জ্জনের সংগ্রাম গড়ে তোলে, সেই আন্দোলনের পথেই স্বাধীন মানুষের বাঞ্ছিত সমাজ সৃষ্টির উজ্জ্বলতর সম্ভাবনা। দেশের আর্থিক উন্নয়নের দুটি পথ আজ খোলা আছে: একদিকে রাষ্ট্র অথবা ধনিক গোষ্ঠির অপ্রতিহত প্রতাপ ও এক-নায়কত্বের পথ; অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার ও যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্র, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মুখ্য সংস্থাগুলির ক্রমপ্রসরমাণ সহযোগিতা বা সমবায়ের পথ। শিল্প বিপ্লবের এই প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে আমাদের পথ বেছে নেওয়ার সময় এসেছে; সমবায়ের পথই গণতন্ত্রের পথ।